পরিবেশ বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

ওড়িশা বিদ্যালয় শিক্ষা কার্য্যক্রম প্রাধিকরণ,
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

পরিবেশ বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণী

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ

ড. দিগরাজ ব্রহ্মা
শ্রী বৈকুন্ঠ নাথ নায়ক
ড. মীনাক্ষী পণ্ডা
শ্রীমতী স্নেহপ্রভা মহাপাত্র
শ্রী প্রমোদ কুমার মল্লিক
সুশ্রী লিপিকা সাহু

সমীক্ষক ঃ

শ্রী নিরঞ্জন জেনা
ড. বসন্ত কুমার চৌধুরী
সুশ্রী জ্যোতির্ময়ী বেহেরা
শ্রীমতী গীতাঞ্জলী পট্টনায়ক
শ্রী সন্তোষ কুমার পরিডা

সংযোজনা ঃ

ড. প্রীতিলতা জেনা
ড. তিলোত্তমা সেনাপতি
ড. সবিতা সাহু

অনুবাদক মন্ডলী ঃ

প্রফেসার দীপাস্য কুণ্ডু (অনুবাদক)
শ্রীমতী সুচিত্রা দাস
শ্রীমতী মধুমিতা ব্যানার্জ্জী (সমীক্ষক)

সংযোজনা ঃ

ড. সবিতা সাহু

প্রকাশক ঃ

বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ
ওড়িশা সরকার

মুদ্রণের বর্ষ ঃ

২০১০, ২০১৯

প্রস্তুতি ঃ

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ওড়িশা, ভুবনেশ্বর
ও
ওড়িশা রাজ্য পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন ও প্রকাশন সংস্থা, ভুবনেশ্বর

মুদ্রণ ঃ

পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

জগজ্জননীর চরণে অদ্যাবধি আমি যে সব উপঢৌকন দিয়েছি, সেগুলির মধ্যে মৌলিক শিক্ষা আমার সবচেয়ে বেশি ক্রান্তিকারী ও মহত্ত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এর চেয়ে অধিক মহত্ত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উপঢৌকন আমি যে জগতের সামনে রাখতে পারব, তা আমার মনে হয় না। এতে রয়েছে আমার সমগ্র রচনাত্মক কার্য্যক্রমকে প্রয়োগাত্মক করার চাবিকাঠি। যে নূতন দুনিয়ার জন্যে আমি ছট্‌ফট করছি, তা এর থেকেই উদ্ভব হতে পারবে। এ আমার অন্তিম অভিলাষ বললেও চলে।

মহাত্মা গান্ধী

সূচীপত্র

অধ্যায়		প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঃ	সামাজিক শৃঙ্খলা	১
দ্বিতীয়	ঃ	আমরা কিভাবে আমাদের শাসন করি	৯
তৃতীয়	ঃ	খাদ্য উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী	১৮
চতুর্থ	ঃ	আমাদের দেশ ও আমাদের পৃথিবী	৩২
পঞ্চম	ঃ	আমাদের দেশের ভূমিরূপ ও জলবায়ু	৩৯
ষষ্ঠ	ঃ	আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও শিল্প	৫৫
সপ্তম	ঃ	ভারতের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান	৭০
অষ্টম	ঃ	আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা	৭৮
নবম	ঃ	আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানি	৮২
দশম	ঃ	আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন	৮৯
একাদশ	ঃ	আমাদের প্রগতি	৯৮
দ্বাদশ	ঃ	স্বাস্থ্য ও রোগ	১১৯
ত্রয়োদশ	ঃ	আবর্জনার নিষ্কাশন ও সদুপযোগ	১৩০
চতুর্দশ	ঃ	বিপর্যয় ও সুরক্ষা	১৩৭
পঞ্চদশ	ঃ	প্রাথমিক চিকিৎসা	১৪০
ষোড়শ	ঃ	সবাই একই রকমের নয়	১৪৭
সপ্তদশ	ঃ	জঙ্গল ও মৃত্তিকাক্ষয় এবং জল প্রদূষণ	১৫৭
অষ্টাদশ	ঃ	শক্তি ও কার্য	১৬৩
ঊনবিংশ	ঃ	বায়ু	১৭৩
বিংশ	ঃ	বায়ু প্রদূষণ	১৮৩
একবিংশ	ঃ	আমাদের জীবনে বিজ্ঞান	১৮৮
দ্বাবিংশ	ঃ	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার	১৯৮

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক শৃঙ্খলা

গাঁয়ের মাঝে মোহনবাবুর ঘর। মিটু ও মিকি তাঁর দু'টি সন্তান। মিঠু পঞ্চম শ্রেণীতে ও মিকি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। মোহনবাবুর ছোট পরিবার। মোহনবাবুর গান শোনার ভারি সখ। তাই তিনি সকালে উঠে ও অফিস থেকে ফেরার পরে বেশ জোরে টেপ চালিয়ে গান শোনেন। নিজের ছেলেমেয়েরা সেই শব্দে পড়া পড়তে পারে না। গাঁয়ের মাঝে ঘর হওয়ার ফলে পাশের ঘরের ছেলেমেয়েরাও পড়তে পারে না। সবাই সকাল সন্ধে খেলে। পাশের বাড়ির মাসীমা পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। ঠাকুমাও পুরাণ পড়তে পারে না। কিছুদিন পরে দেখা গেল মোহনবাবুর ছেলেমেয়েরা ও পাশের ঘরের ছেলেমেয়েরা কেউপরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি। বল দেখি, এই সব অসুবিধা হওয়ার কারণ কি? (বল ও লেখো)

শিক্ষক বললেন, প্রত্যেকদিন অত্যধিক জোরে গান শোনা মোহনবাবুর এক বদ্ অভ্যাস। তাঁর এই বদ্ অভ্যাসের জন্য সকলে অসুবিধেয় পড়ল।

এই চিত্রগুলি দেখ। এদের মধ্যে বদ্ অভ্যাসের চিত্রগুলি চিহ্ন দিয়ে চিনিয়ে দাও।
তোমার জানা কয়েকটি ভাল ও মন্দ অভ্যাসের নাম লেখো।

ভাল অভ্যাস	বদ্ অভ্যাস
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■

আমরা সকলে সমাজে বাস করি। সমাজ কিছু নীতি নিয়ম মেনে চলে। কিছু কাজের দ্বারা সমাজের নিয়ম ভঙ্গ হয়। সমাজে নিজের মত অন্যরাও যেন সুখে স্বাচ্ছন্দে সমাজে বাস করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এর জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে মানুষকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর ফলে প্রত্যেক কার্য শৃঙ্খলিত হয়। এ সব নিয়ম পালন না করার অর্থ হচ্ছে বদ্ অভ্যাস।

সমাজে কিছু লোক নানা প্রকার অপরাধ করে, যথাঃ- চুরি, ডাকাতি, মারপিট করা, ধমক চমক দেওয়া ও জোর জবরদস্তি চাঁদা আদায় করা ইত্যাদি। অনেক সময় লোকেরা ঘরবাড়ি, সরকারী ও বেসরকারী অনুষ্ঠানের আসবাবপত্র, গাড়ি মোটর ইত্যাদি ভাঙাভাঙি বা পোড়াপুড়ি এবং লুটতরাজ করে। কিছু লোক আবার বিনা টিকিটে বাস, ট্রেনে যাতায়াত করে ও প্লাটফর্মেও টিকিট না নিয়ে প্রবেশ করে। ফলতঃ সমাজের তথা দেশের অনেক ক্ষতি হয়। এ সব অপরাধমূলক কাজ। এগুলি বদ্ অভ্যাস।

তোমার অঞ্চলে সংঘটিত অপরাধগুলির নাম লেখো।

যেমন —

- সোনার দোকান ছিনতাই করা
- মোটর সাইকেল চুরি করা

একটু চিন্তা করে বল ও লেখো।
মদ খেয়ে গাড়ি চালালে কি অসুবিধা হবে?

মদ্যপান, গঞ্জিকা সেবন, ড্রাগ-আসক্তি, আফিম ইত্যাদি খাওয়ার ফলে মানুষের মনে এক সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। যার ফলে সে নিজের হিতাহিত জ্ঞান ভুলে যায়। তখন সে গুন্ডাগিরি, অবিবেকিতা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কোন্‌টি ভুল ও কোন্‌টি ঠিক সে জানতে পারে না। ওরা মদ্যপানের জন্য ঘরে কিংবা বাইরে সাধারণ লোককে ভয়চকিত করে টাকা আদায় করে। সেজন্য সাধারণ লোক ওদের ভয় ও ঘৃণা করে।

অপরাধ নিরাকরণের উপায় ঃ

১. ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করা দরকার কারণ শিক্ষা মানুষকে ঠিক পথে নিয়ে যায়।

২. বদ্ অভ্যাস ও তার জন্য সংঘটিত দুর্ঘটনা ও অপরাধ দূরদর্শনে দেখানো তথা রেডিওতে প্রচার করা।

৩. বিদ্যালয়ে বদ্অভ্যাস ও তজ্জনিত অসুবিধা বিষয়ে তর্কসভা ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হওয়া দরকার।

৪. বদ্ অভ্যাস ও অপরাধ সম্পর্কীয় যাত্রা এবং গীতিনাট্য অলিগলিতে হওয়া দরকার।

৫. অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

৬. নেশাদ্রব্য শরীরের কি প্রকার ক্ষতি সাধন করে, সে বিষয়ে সকলকে সচেতন করা একান্ত আবশ্যক। অপরাধ নিরাকরণের জন্য আর কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, নিজে ভেবে লেখো।

আমরা কি শিখলাম —

- বদ্ অভ্যাস, অভদ্র আচরণ নিজের ক্ষতি করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যাদেরও ক্ষতি করে।
- সমাজের নীতি নিয়ম না মেনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করার অর্থ বদ্ অভ্যাস।
- অসচ্চরিত্র লোকেরা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।
- চুরি, ডাকাতি, হিংসাত্মক কাজকর্ম, অনধিকার প্রবেশ, মদ খেয়ে গাড়ি চালানো ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ।
- অপরাধ নিরাকরণের জন্য নানা প্রকার পন্থা রয়েছে। তা অনুসরণ করলে আমরা অপরাধ কমাতে পারবো।

অভ্যাস

১. নিম্নলিখিত অভ্যাসগুলির মধ্যে বদ্ অভ্যাস ও ভাল অভ্যাসগুলি নীচের সারণীতে লেখো।

রাস্তার মাঝে সাইকেল চালানো, ধূমপান করা, গান গাওয়া, প্রতিদিন সিনেমা দেখা, ছুটিতে বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাওয়া, জোরে মাইক বাজানো, খবর কাগজ পড়া, বিদ্যালয়ের দেওয়াল নোংরা করা, রাস্তার ধারে গাছ লাগানো, ঠিক সময়ে খাজনা দেওয়া, বেঞ্চ, গাছ, টায়ার জ্বেলে রাস্তা অবরোধ করা, জবরদস্তি চাঁদা আদায় করা, অন্য লোকের বাগান থেকে ফুল ও ফল চুরি করা।

ভাল অভ্যাস

বদ্ অভ্যাস

২. তোমার জানা যে কোন ৫টি অপরাধের নাম লেখো।

৩. তোমার কোন এক সম্পর্কীয় মদ্যপান করলে তুমি কি করবে ?

৪. তোমার অঞ্চলে সংঘটিত অপরাধগুলির তালিকা প্রস্তুত কর। সেই অপরাধগুলি কীভাবে নিরাকরণ করা যেতে পারে তার উপায়গুলি লেখো।

অপরাধ	নিরাকরণের উপায়

৫. নীচে কয়েকটি উক্তি দেওয়া হয়েছে। সেই উক্তিগুলির মধ্যে তোমার যেগুলো ভাল লাগে সেই উক্তিগুলিতে এই (✓) চিহ্ন দাও।

ক) নিয়মিত বিদ্যালয় যাওয়া।

খ) ঘরের অপরিষ্কার জল রাস্তায় বের করা।

গ) রাস্তার ধারে পায়খানা করা।

ঘ) রাস্তায় ময়লা জমা করা ও রাস্তায় কলার খোসা ফেলা।

ঙ) রাস্তার বিজলি বাতি পাথর ছুঁড়ে ভাঙা।

চ) প্রার্থনা শেষে লাইন দিয়ে নিজের শ্রেণী কক্ষে যাওয়া।

ছ) বন্ধুদের সঙ্গে গন্ডগোল করা

জ) দিনের বেলায় অনাবশ্যক বিজলি বাতি জ্বালানো।

ঝ) গুরুজনদের সন্মান প্রদর্শন করা।

৬. যে কোন ৪টি বদ্ অভ্যাস লেখো।

৭. নিম্নোক্ত উক্তিগুলি পড় । অপরাধ নিরাকরণের জন্য সহায়ক হওয়ার মত উক্তি পার্শ্বে এই (✓) চিহ্ন ও সহায়ক না হওয়ার মত উক্তি পার্শ্বে (X) চিহ্ন দাও ঃ

- চুরি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরজা ও জানালাগুলি মজবুত করা ।
- আমাদের টাকা পয়সা ও সোনার অলঙ্কার সুরক্ষিত স্থানে রাখা ।
- উত্তম ব্যবহারের জন্য সকলকে উৎসাহিত করা ।
- অপরাধের কুপরিণাম সম্পর্কে সভা-সমিতি ও পথশ্রুতি নাটিকা মাধ্যমে জনসাধারণকে অবগত করা ।
- মদ খেয়ে গোলমাল করলে পুলিশকে জানানো ।
- ওজনে ঠকানো লোকেদের কোন বাধা না দেওয়া ।
- চোর ধরার জন্য ঘরে কুকুর পোষা
- স্থানীয় পরিচিত অপরাধীদের উপরে পুলিশের সজাগ দৃষ্টি রাখা ।
- দোষীকে কঠোর শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা ।
- অপরাধীকে জেনেও পুলিশকে খবর না দেওয়া ।
- স্থানীয় মানুষদের স্বইচ্ছায় কিছু পয়সা দিয়ে রাত্রে পাহারাদার রাখার ব্যবস্থা করা ।
- রেডিও, দূরদর্শন ও দৈনিক সংবাদপত্রে অপরাধ নিরাকরণ সম্পর্কে প্রচার করা ।
- অপরাধীর চরিত্র পরিবর্তনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা ।
- খারাপ ব্যবহার সহ্য করা ।
- অপরাধ ঘৃণার যোগ্য কিন্তু অপরাধী নয় ।

বাড়ির কাজ —

- অপরাধ নিরাকরণ সম্পর্কীয় কয়েকটি স্লোগান লিখে নিয়ে এসে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করা । সবচেয়ে যার লেখা আকর্ষণীয় হবে, সেই শিক্ষার্থীর প্রশংসা করা হবে ।
- সংবাদপত্র থেকে অপরাধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কর ও শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন কর ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা কিভাবে আমাদের শাসন করি।

নীচের শ্রেণীতে আমরা ''স্বায়ত্তশাসন'' ব্যবস্থা বিষয়ে পড়েছি। এস, এবার আমরা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকার গঠন বিষয়ে পড়বো ও তাদের সম্পর্কে জানবো।

আমাদের ওড়িশার শাসন করার জন্য বিধানসভা আছে। বিধানসভা গৃহ আমাদের রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে অবস্থিত। এই সভার সভ্যবৃন্দ লোকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এঁদের বিধায়ক বলা হয়।

তোমার অঞ্চলের বিধায়কের নাম নীচের কুঠরিতে লেখো।

আমাদের রাজ্য সরকার গঠন ঃ

ওড়িশা বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ১৪৭। এই সদস্যরা লোকেদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ১৮ বছরের বেশি বয়সের লোকেরা ভোট দিয়ে নিজের নিজের নির্বাচনমন্ডলীর জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা লোকেদর মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার দরুণ আমাদের রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে ''গণতান্ত্রিক'' শাসন ব্যবস্থা বলে বলা হয়। এই নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে রাজ্য বিধানসভা গঠিত হয়। রাজ্য বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ক্যাবিনেটমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সব মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রীমন্ডল তৈরী হয়। মন্ত্রীমন্ডল সাধারণত ৫ বছরের জন্য কার্য করে। এক একজন মন্ত্রীর অধীনে এক বা একাধিক বিভাগ থাকে। রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হলেন রাজ্যপাল। তাঁর নামে রাজ্যশাসন নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যপালকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন।

আমাদের রাজ্যের বর্তমান রাজ্যপালের নাম কি?

আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি?

আমাদের রাজ্যের বর্তমান বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা মন্ত্রীর নাম কি?

আমাদের রাজ্য সরকারের তিনটি অঙ্গ ঃ

১. আইন তৈরি সংস্থা
২. আইন কার্যকারী করার সংস্থা
৩. আইন তর্জমা করার সংস্থা

আমাদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা

কেন্দ্র সরকার কাদের দ্বারা গঠিত ?

সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমগ্র শাসনের জন্য জাতীয় স্তরে আমাদের দেশের রাজধানী নূতন দিল্লীতে কেন্দ্র সরকার গঠন করা হয়েছে। রাজ্য শাসনের মত কেন্দ্র শাসনের তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে। যথাঃ আইন তৈরি সংস্থা, আইন কার্যকারী করার সংস্থা ও আইনের তর্জমা করার সংস্থা।

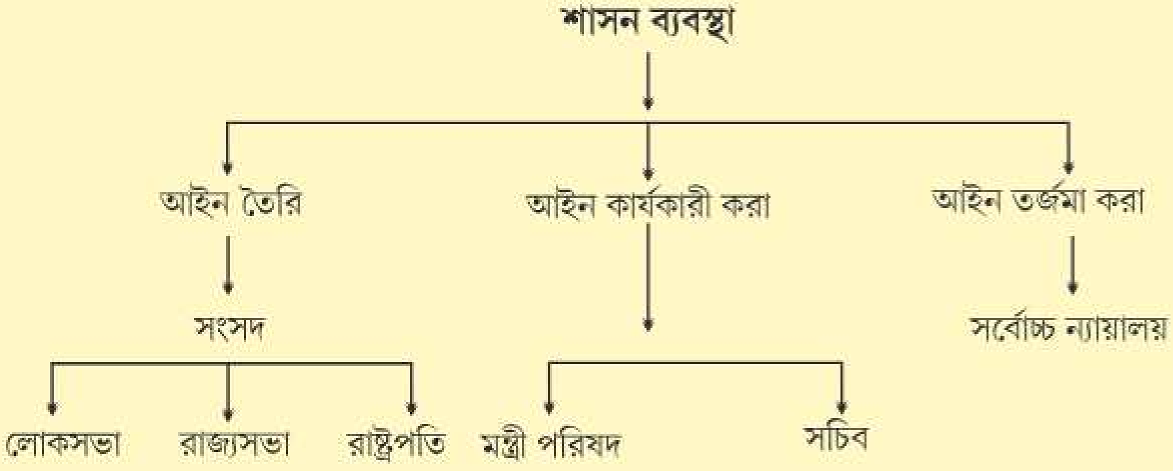

আমাদের দেশের আইন কীভাবে তৈরি করা হয় ও কার্যকারী হয় ?

আমাদের দেশের আইন গড়ার জন্য পার্লামেন্ট বা সংসদ রয়েছে। এখানে দু'টি সভা আছে। একটি লোকসভা ও অন্যটি রাজ্যসভা। রাষ্ট্রপতিও পার্লামেন্টের এক অংশ। এস লোকসভা, রাজ্যসভা ও রাষ্ট্রপতি বিষয়ে কিছু জানাযাক। লোকসভার সদস্যরা লোকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়। রাজ্যসভার সদস্যরা পরোক্ষভাবে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। কিছু সদস্যকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন করেন।

লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করে সেই দলের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি দেন। প্রধানমন্ত্রীর পারমর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রীদেরও নিযুক্তি দেন।

সব মন্ত্রীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমন্ডল গঠন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী তাদের মধ্যে বিভাগ বন্টন করেন। প্রত্যেক মন্ত্রী নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে নির্বাহ করেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে নিযুক্ত সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ মন্ত্রীদের শাসনক্ষেত্রে সাহায্য করেন।

নিম্নোক্ত তালিকা থেকে লোকসভা ও রাজ্যসভা সম্পর্কিত তথ্য জেনে নাও ঃ

রাজ্যসভা	লোকসভা
এটি এক স্থায়ী সভা।	এটি স্থায়ী সভা নয়। এর কার্যকাল ৫ বছর।
এই সভা দিল্লীতে রয়েছে।	এই সভা দিল্লীতে আছে।
এই সভার সদস্যরা বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।	এই সভার সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে লোকেদের দ্বারা নির্বাচিত হন।
উপরাষ্ট্রপতি এই সভার স্থায়ী সভাপতি।	বাচস্পতি এই সভার সভাপতি।
মোট সদস্য সংখ্যা ২৫০। এদের মধ্যে ১২জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন।	মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কেউ না থাকলে রাষ্ট্রপতি ২ জনকে মনোনীত করেন।
প্রত্যেক সভ্যের সময় কাল ৬ বছর।	প্রত্যেক সদস্যের সময়কাল ৫ বছর।
প্রত্যেক দু'বছরে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। ওঁদের স্থানে নূতন সদস্য নির্বাচিত হন।	
লোকসংখ্যা অনুপাতে সদস্য সংখ্যা স্থির হয়।	লোকসভা অনুপাতে সদস্যসংখ্যা স্থির হয়।
ওড়িশার সদস্য সংখ্যা ১০।	ওড়িশার সদস্যসংখ্যা ২১।

সংসদ ভবন

আমরা রাজ্যসভা, লোকসভা, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমন্ডল বিষয়ে জানলাম। এবার আমরা রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কিছু জানব।

দেশের শাসনব্যবস্থা ঠিকমত চলছে কিনা তা দেখার জন্য উচ্চতম ন্যায়ালয় বা সুপ্রিম কোর্ট রয়েছে। এটি দিল্লীতে অবস্থিত। ভারতের সংবিধান সুরক্ষার দায়িত্ব এর উপর ন্যস্ত। ভারতের শাসন সম্পর্কীয় বিভিন্ন নীতি নিয়ম সংবিধানে লেখা আছে।

কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও স্বায়ত্তশাসন সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক।

কেন্দ্র সরকার	❑ কেন্দ্র সরকার দেশের জন্য উন্নতিমূলক কাজ করে। ❑ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন উন্নতিমূলক কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করে। ❑ রাজ্য সরকারগুলির দেওয়া প্রস্তাবগুলি নিয়ে সমগ্র দেশের জন্য যোজনা প্রস্তুত করে।
রাজ্য সরকার	❑ রাজ্য সরকার নিজের রাজ্যের জন্য উন্নতিমূলক কাজ করে। ❑ রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যের উন্নতির জন্য খসড়া প্রস্তুত করে কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠায়। ❑ রাজ্য সরকার, স্বায়ত্তশাসন সংস্থা প্রদত্ত পরিকল্পনা অনুসারে অনুদান মঞ্জুর করে।
স্বায়ত্তশাসন সংস্থা	❑ স্বায়ত্তশাসন সংস্থা গ্রামাঞ্চল বা শহরাঞ্চলের জন্য উন্নতিমূলক কাজ করে ও যোজনা প্রস্তুত করে রাজ্য সরকারকে দেয়।

স্বায়ত্তশাসন সংস্থা	■ স্বায়ত্তশাসন সংস্থার মাধ্যমে গরীব লোকদের বিভিন্ন প্রকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। যথা- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, রাজীব গান্ধীর পানীয় জল যোজনা, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রাম্য নিশ্চিত কর্মনিযুক্তি যোজনা বা MNREGS ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা লোকের দ্বারাই পরিচালিত হয়। জনসাধারণ ভোট দিয়ে বিধানসভা ও লোকসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের জন্য প্রতিনিধি নির্ধারণ করে। এদের দ্বারাই আমাদের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এরাই সকলের ভালমন্দ বোঝে ও সার্বিক উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করে। অতএব আমাদের দেশের শাসনকে জনসাধারণের দ্বারা শাসন বা গণতন্ত্র শাসন বলা হয়।

তুমি জান কি?

গণতন্ত্র হল এক প্রকার শাসন ব্যবস্থা, যার দ্বারা সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এব্রাহাম লিঙ্কনের মতে, "গণতন্ত্র হচ্ছে জনসাধারণের, জনসাধারণের দ্বারা, ও জনসাধারণের জন্য।"

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা সেই রাজ্যের লোক প্রতিনিধি মারফৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল নিয়নন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে। এর ফলে কোন রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও আমাদের দেশ থেকে পৃথক হতে পারবে না। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করা হয়েছে। অতএব আমাদের দেশ বিভিন্ন রাজ্যগুলির একটি পরিবার বা সংঘ। এই শাসনব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যেতে পারে।

কেন্দ্র ও রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধিরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়। সুতরাং ভোট দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ও কর্তব্য। মাঝে মাঝে অধিকাংশ নাগরিক এবিষয়ে গুরুত্ব আরোপ না করে ভোট দানে বিরত থাকে। এর ফলে এক দক্ষ সরকার গঠনে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। দেশে এক সুদৃঢ় সরকার গঠন নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তিকে সকলে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা উচিত। এ জন্য সংবিধানে ১৮ বছরের বেশি সব মানুষকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

তোমার বাড়িতে ক'জন ভোটার আছে?
তাদের নাম ও বয়স লেখো।

আমাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু থাকায় জনসাধারণের কি সুবিধা হচ্ছে অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

আমরা কি শিখলাম।

- আমাদের দেশের লোক নিজের প্রতিনিধি মনোনীত করে ও ওদের দ্বারা আমাদের শাসন পরিচালিত হয়।
- আমাদের রাজ্যের শাসনে বিধানসভার সভ্য, মন্ত্রীমন্ডল, রাজ্যপাল অংশগ্রহণ করেন।
- আমাদের দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার বা সংঘ সরকারের মাধ্যমে।
- কেন্দ্রীয় সাসন ব্যবস্থায় সংসদ, মন্ত্রীমন্ডল, রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি সকলেই অংশগ্রহণ করেন।
- আমাদের দেশ এক গণতান্ত্রিক ও সংঘীয় রাষ্ট্র।
- ১৮ বছরের বেশি সকল মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে।

অভ্যাস

১. প্রত্যেক প্রশ্নের নীচে প্রদত্ত উত্তরগুলির মধ্যে ঠিক উত্তরটি বেছে লেখো।

ক) রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা কে?

১) মুখ্যমন্ত্রী

২) প্রধানমন্ত্রী

৩) রাষ্ট্রপতি

৪) প্রধান বিচারপতি

খ) কে নির্বাচিত নন?

১) মুখ্যমন্ত্রী

২) প্রধানমন্ত্রী

৩) রাজ্যপাল

৪) রাষ্ট্রমন্ত্রী

গ) নিম্নলিখিত কি প্রকার শাসন আমাদের দেশে গৃহীত?

১) গণতান্ত্রিক শাসন

২) সামরিক শাসন

৩) রাজার শাসন

৪) একচ্ছত্রবাদ শাসন

২) ভারতের সংসদ (পার্লামেন্ট) কাদের নিয়ে গঠিত?

৩) ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন?

৪) লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে পার্থক্যগুলি নির্দেশ কর।

৫) নীচে কয়েকটি কাজকর্মের তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই কার্যগুলি সম্পাদনের জন্য কোন স্তরে নিষ্পত্তি নেওয়া হয় (✓) চিহ্ন দ্বারা দেখাও।

	স্বায়ত্তশাসন	রাজ্য	কেন্দ্র
ক) চলতি বছর ওড়িশার সমস্ত কৃষককে বিনামূল্যে বিদ্যুতের আলো প্রদান।			

	স্বায়ত্তশাসন	রাজ্য	কেন্দ্র
খ) এক নূতন ১০০০ টাকার নোটের প্রচলন	⬠	⬠	⬠
গ) জম্মু থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত দু'টি ট্রেন চালানোর নিষ্পত্তি	⬠	⬠	⬠

৬) তালিকাভুক্ত খালি ঘরগুলি পূরণ কর।

নাম	কার্যকাল	সদস্যসংখ্যা	কোথায় অবস্থিত
আমাদের রাজ্যের বিধানসভা			
লোকসভা			
রাজ্যসভা			

৭) তুমি প্রধানমন্ত্রী হলে কি করবে? ৫টি বাক্যে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

খাদ্য উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমজীবী

কর্মই জীবন। প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। ওদের কুশলী কর্মসাধনে সমাজের সকলে উপকৃত হয়। এস, আজ আমরা পরিবহন, যাতায়াত ও যোগাযোগ কার্যে নিয়োজিত বিভিন্ন শ্রমজীবীদের বিষয়ে আলোচনা করি।

যাতায়াত ও পরিবহন ক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মজীবী

আমরা আমাদের কাজের প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাই। সেজন্য আমরা সাইকেল, রিক্সা, মোটর সাইকেল, বাস, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদির সাহায্য নিই। তেমনি এক জায়গা থেকে মালপত্র ও বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ সবই যাতায়াত ও পরিবহনের কার্য। এ সব কাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকারের কাজে নিযুক্ত থাকে।

যাতায়াতের জন্য রাস্তা একান্ত আবশ্যক। রাস্তা নির্মাণের কাজে বহু শ্রমিক, ঠিকাদার, যন্ত্রী নিযুক্ত থাকে। রাস্তা তৈরির কাজে নুড়ি (চিপস) রাম, পিচ, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি সামগ্রী আবশ্যক। এ সব কার্য সম্পাদনের জন্য ও সামগ্রী সরবরাহের জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। রাস্তার নক্সাও দক্ষ যন্ত্রীদের সাহায্যে প্রস্তুত হয়।

সড়ক নির্মাণের কাজে সাধারণত ঠিকাদারদের নিয়োগ করা হয়। তিনি ঐ কাজের জন্য শ্রমিক মজুরদের নিয়োজিত করেন। রাস্তার নির্মাণ কার্য ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা যন্ত্রীরা তদারক করেন।

■ নীচের কুঠুরিতে তোমার দেখা রাস্তা নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত কিছু

শ্রমজীবীর কার্যকলাপ সম্পর্কে লেখো।

	রাস্তার কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী	রাস্তা নির্মাণের সময় তার কাজ
১.		
২.		
৩.		

তুমি জান যে, লোকেরা যাওয়া আসা ও পণ্য সরবরাহের জন্য গরুর গাড়ি, রিক্সা, ট্রাক ইত্যাদি যানবাহন ব্যবহার করে। এ সব যান বাহন সড়ক পথে চলাচল করে। কিছু শ্রমিক মাল ওঠানো নামানোর কাজ করে। আবার কয়েকজন গাড়ি চালানো(চালক বা ড্রাইভার) ও তাকে সাহায্য করার কাজ (সাহায্যকারী) করে।

আমরা বাসে যাতায়াত করার সময় বিভিন্ন কর্মচারীর কার্যরত অবস্থা লক্ষ্য করি। বাসে কোন কর্মচারী কোন কাজ করে নীচের কুঠরিতে তা লেখো।

ট্রাক পরিবহন

কর্মচারীর কার্যক্রম	কোন কর্মচারী সে কাজ করে
গাড়ি চালানোর কার্য	
বাসভাড়া আদায় করা কার্য	
গাড়িতে জিনিসপত্র উঠানো ও লোককে সাহায্য করা কার্য	

তোমার লেখাতে স্পষ্ট জানা গেল যে, ড্রাইভার গাড়ি চালাবার কাজ করে। যাত্রী সাধারণের যাত্রাকালীন নিরাপত্তা থাকে তার হাতে। সে রাস্তার নিয়ম মেনে গাড়ি চালানোর জন্য দুর্ঘটনা ঘটে না। কন্ডাক্টর যাত্রীদের কাছ থেকে যাত্রার জন্য বাসভাড়া আদায় করে ও সেজন্য রসিদ দেয়। কন্ডাক্টারের সাহায্যকারী (হেলপার) যাত্রীর জিনিসপত্র গাড়িতে তোলা ও গন্তব্যস্থানে নামানোর কাজে সাহায্য করে। যাত্রাকালীন সময়ে আবশ্যকতা অনুসারে যাত্রীদের সাহায্যও করে। এইভাবে ড্রাইভার, কন্ডাক্টার ও হেল্পার আমাদের সাহায্য করে।

আমাদের সেবাকার্যে নিয়োজিত বাস, ট্রাক, রিকসা প্রভৃতি যানবাহনগুলির বিভিন্ন সময়ে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়। সুতরাং সেইসব গাড়ির মেরামতি দরকার হয়। গাড়ির মেরামতি কাজের জন্য

রেল লাইন ও রেল গাড়ি

এখানে মিস্ত্রীরা গাড়ি মেরামতি করে এবং তাদের শ্রমের বিনিময়ে ন্যায্য পাওনা নেয়।

যাতায়াত ও পণ্য পরিবহনের প্রয়োজনে আমাদের দেশে সড়ক ব্যবস্থার মত রেল ব্যবস্থাও আছে। আমাদের দেশের প্রধান শহর, বন্দর ও কলকারখানার পাশাপাশি শহরগুলি রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

রেল পথে ট্রেন ছুটতে ছুটতে কখনো কখনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্টেশন ও প্ল্যাটফর্মে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দাঁড়ায়। স্টেশনের কাজ স্টেশন মাস্টার পরিচালনা করে। এই কার্যক্ষেত্রে অন্য কর্মচারীরাও তাকে সাহায্য করে। স্টেশনে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে নির্বিঘ্নে আসা-যাওয়ার দায়িত্ব সিগ্ন্যাল ম্যানের উপর ন্যস্ত থাকে। সে বিভিন্ন সংকেত মাধ্যমে স্টেশনে ট্রেনের যাওয়া আসা নিয়ন্ত্রণ করে। যথাযথভাবে তা না করলে দুর্ঘটনা ঘটবে ও যাত্রীদের ধনজীবন বিপর্যস্ত হবে। এর থেকে কার্যক্ষেত্রে তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। স্টেশনে টিকিট বিক্রির জন্য কর্মচারী নিযুক্ত থাকে।

রেল পরিবহন

যাত্রীবাহী ট্রেনে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করে টি.টি.আই। ট্রেন চালানোর জন্য আছে ড্রাইভার। নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ট্রেন যাত্রার মত গুরুদায়িত্ব পালনে সে সদা তৎপর। রেল পরিষেবা ঠিক আছে কিনা তদারকের জন্য স্বতন্ত্র নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। সেইমত রেল সুরক্ষা বাহিনী (আর.পি.এফ.) রেলযাত্রীদের যাত্রাকালীন নিরাপত্তার দিকে সর্বদা সজাগ থাকে। প্রত্যেক রেলগাড়িতে একজন করে গার্ড থাকে, তার উপরে থাকে রেলগাড়ির দায়িত্ব।

জলপথে কর্মরত কর্মজীবী ঃ

আমাদের দেশের জলপথে নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদি চলাচল করে। মাঝি দাঁড় ও পালের সাহায্যে নৌকা চালায়। লঞ্চ, স্টিমার ও জাহাজ ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে। লঞ্চ ও স্টিমার চালানোর জন্য তালিম প্রাপ্ত চালক থাকে। জলজাহাজ চালায় নাবিক। জাহাজের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতের জন্য ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিক কাজ করে। পুরো জাহাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে একজনের উপরে। তাকে ক্যাপ্টেন বলা হয়। জাহাজে বেতার চালক, রাডার নিয়ন্ত্রক কর্মচারীরাও আবশ্যকীয় কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে।

জলযাত্রা ভীষণ কষ্টদায়ক ও বিপদপূর্ণ। সেখানে কর্মরত কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার জন্য যাত্রী সুরক্ষিত ও নিরাপদ জলযাত্রা করতে পারে।

■ নাবিক অন্যমনস্ক হয়ে জলযান চালালে কি ঘটতে পারে লেখো।

____

____

____

____

উড়োজাহাজে কর্মরত শ্রমজীবী

জলপথের মত আকাশ পথে দেশ বিদেশের বিভিন্ন রাজধানী ও প্রধান প্রধান শহরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কম সময়ের মধ্যে উড়োজাহাজের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে পৌঁছানো যায়।

বিমানঘাটি, উড়োজাহাজ ও কর্মচারী

উড়োজাহাজে কোথাও যেতে হলে প্রথমে বিমানঘাঁটি যেতে হয়। বিমানঘাঁটির প্রবেশ পথে এক কর্মচারী টিকিট পরীক্ষা করার সময় পরিচয় পত্রও পরীক্ষা করে ও তারপরে বিমান ঘাঁটির ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। সেখানের সুরক্ষাকর্মীরা বিমানঘাঁটির নিরাপত্তার জন্য আমাদের ও আমাদের জিনিসপত্র পরীক্ষা করে। তারপরে নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে জিনিসপত্র জমা দিতে হয়। কাউন্টারের কর্মচারী আমাদের ব্যাগ নিয়ে আমাদের রসিদ দেয়।

বিমানে প্রবেশ করার সময় বিমান পরিচারিকা প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে স্বাগত জানায়। সে বিমানের ভিতরে আমাদের যাত্রাকালীন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ যুগিয়ে দেয়। যারা বিমান চালানোর দায়িত্ব পালন করে তাদের পাইলট বলা হয়। পাইলটদের মধ্যে একজন মুখ্য পাইলট থাকে। বিমান চালনাক্ষেত্রে তাকে সহকারী পাইলট সাহায্য করে। বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার (যন্ত্রী) তা মেরামত করে দেয়। পাইলটদের দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ, তাদের গাফিলতিতে অনেক জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

যোগাযোগ ক্ষেত্রে কার্যরত শ্রমজীবী

বৈজ্ঞানিক যুগে যোগাযোগ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। আমরা এক স্থানে বসে অল্প সময়ের মধ্যে দেশ ও বিদেশের খবর জানতে পারি।

এই যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি হল — ডাক, টেলিফোন, মোবাইল, সংবাদপত্র, রেডিও, দূরদর্শন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি। এইসব সংস্থায় অনেক কর্মচারী কাজ করে। ডাকঘরে পোস্টমাস্টার কাজ করে। ডাকঘরের সব দায়িত্ব তার। তাকে কেরানী, ডাক

পিয়ন সাহায্য করে। পিয়ন ঘরে ঘরে গিয়ে চিঠিপত্র বিলি করে। ওই কাজে তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়।

- তোমার অঞ্চলের ডাক ব্যবস্থা অনুধ্যান কর। ডাক পিয়ন ঠিকানা অনুযায়ী প্রাপকদের যদি চিঠি না দেয়, তবে পত্রপ্রেরক ও পত্র প্রাপকের কি কি অসুবিধা হয় লেখো।

তোমরা সংবাদপত্র (খবর কাগজ) নিশ্চয় অনেক পড়েছ। এর মাধ্যমে দেশ, বিদেশ ও তোমার রাজ্য ও অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকারের খবর জানতে পার। এই সংবাদপত্র প্রস্তুত করার কাজে সাংবাদিক, সম্পাদক, পরিচালক, কুশলী কর্মচারী নিযুক্ত থাকে। মুদ্রণকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী মুদ্রণযন্ত্রে সে সব খবরাখবর কাগজে ছাপিয়ে বের করে। সংবাদ সংগ্রহ সাংবাদিকের প্রধান কাজ। কিছু কর্মচারী সংবাদপত্র ছাপাখানা থেকে এনে বিক্রি করে।

দূরের বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য টেলিফোন ও মোবাইলের সাহায্য প্রয়োজন। টেলিফোন কার্যালয়ে কর্মরত কর্মচারীরা এ সব কাজে বেশ দক্ষ। তেমনি বিভিন্ন কম্পানীতে নিযুক্ত কর্মচারীরা আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে দূরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার সুবিধা করে দেয়। তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারী যুক্ত থাকে। বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে আমরা দেশ বিদেশের খবর জানতে পারি। এতে অনেক চিত্তাকর্ষক কার্যক্রম পরিবেশিত হয়। বেতার কেন্দ্র ও দূরদর্শন কেন্দ্রে বহু কর্মচারী কাজ করে। তাদের মধ্যে কেন্দ্র নির্দেশক কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকেন। সংবাদ বিভাগে সাংবাদিক ও সম্পাদক কাজ করেন। এতদ্ব্যতীত প্রযোজক, যন্ত্রী ও অন্যান্য অনেক কর্মচারী বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। কাজের মাধ্যমে তারা আমাদের সেবাই করে। তাদের কাজও অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা দেশ বিদেশের খবর জানতে পারি। এ ছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আবহাওয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কীয় বহু তথ্য অতি সহজে পেয়ে যাই। এই সংস্থাতেও বহু কর্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে। তাদের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের যে কোন স্থানের তথ্য আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। রেডিও, টিভি ও মোবাইল সারানোর জন্য কুশলী কর্মচারীও রয়েছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের গুরুত্ব

- তোমার অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন কিছু জিনিসপত্রের তালিকা সহ তুমি অন্য অঞ্চলের উপরে নির্ভর কর এমন কিছু জিনিসপত্রের তালিকা নীচের কুঠরিতে লেখো।

তোমার অঞ্চলে পাওয়া যায় এমন কিছু জিনিসপত্রের তালিকা	অন্য অঞ্চলের উপর নির্ভর করা জিনিসপত্রের তালিকা

তোমার প্রস্তুত করা তালিকা থেকে স্পষ্ট যে, তোমার প্রয়োজন মত জিনিসপত্র তোমার অঞ্চলে পাওয়া যায় না। তুমি অন্য অঞ্চলের উপরে সেই সব জিনিসপত্রের জন্য নির্ভর কর। কারণ আমাদের দেশের সব অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু সমান নয়। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের ফসল আবাদ করা হয়। এ জন্য ব্যবসায়ীরা যে অঞ্চলে যে খাদ্য পদার্থ ও বিভিন্ন দ্রব্য পাওয়া যায় সে গুলি সংগ্রহ করে অন্য স্থানে বিক্রি করে। তেমনি বিভিন্ন কল কারখানায় উৎপাদিত জিনিসপত্রও চাহিদা অনুযায়ী লোকের নিকটে পৌঁছে দেয়। এই ব্যবসা বাণিজ্য কার্যেও বিভিন্ন কর্মজীবী নিয়োজিত থাকে। এতে কেউ কেউ অর্থ বিনিয়োগ করে আবার কেউ বা শ্রমদান করে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যে প্রধান পরিচালক তার কর্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠানে মাল আনা, সংগ্রহ করা, বিক্রয় করা এ সব তদারকের দায়িত্ব তার। পয়সা আদায় করার দায়িত্বও তার উপর ন্যাস্ত। ক্রেতাকে দ্রব্য সামগ্রী দেওয়ার জন্য আলাদা কর্মচারী থাকে। ওদের মধ্যে ওজন, মেপে নেওয়া ও মাল বহন করার জন্য পৃথক লোক থাকে। সকলকে নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করা দরকার।

সৈনিক, পুলিশ ও শিক্ষকের কাজের গুরুত্ব ঃ

আমাদের দেশের সুরক্ষা আমাদের দেশের সৈনিকদের উপরে নির্ভর করে। ওরা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, কুয়াশা ইত্যাদি কিছুকেই উপেক্ষা করে না। দেশের সীমান্ত অঞ্চলে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দিবারাত্রি অকুতোভয়ে পাহারা দেয়। বস্তুত এদের অসীম সাহসিকতার ফলেই আমরা শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাই। আমাদের দেশও সুরক্ষিত থাকে।

সৈন্যদের কেন্দ্র করে আমাদের দেশে তিনটি বাহিনী গঠন করা হয়েছে। সেগুলি হল নৌবাহিনী, স্থলবাহিনী ও আকাশবাহিনী। দেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় যথাঃ ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ হলে সৈন্যরা বিপর্যস্ত লোকেদের সাহায্য করে। আবশ্যক ক্ষেত্রে রিলিফ বন্টনেও সাহায্য করে।

আমাদের রাজ্য ও দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃংখলা রক্ষা করার কাজে পুলিশ রয়েছে। ওরা সাধারণত চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে লোকে এবং যানবাহনগুলি নিয়ম মাফিক রাস্তায় যাতায়াত করতে পারে ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়। রাস্তায় দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ট্রাফিক নিয়মাবলী রয়েছে। সেগুলি নীচে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি দেখে বুঝে রাস্তায় যাতায়াত করা উচিত।

ট্রাফিক পুলিশ ও ট্রাফিক সূচনা

রাস্তায় আসা যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে বিভিন্ন ধরনের ট্রাফিক সংকেত দেখা যায়। এই ট্রাফিক সংকেত গুলি সব গাড়িচালক ও পথচারীদের জানা জরুরী, নচেৎ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। ফলে দুর্ঘটনা ঘটবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ ট্রাফিক সংকেত তিন প্রকার।

১. **বাধ্যতামূলক ট্রাফিক সংকেত।**

এই সংকেতগুলি সাধারণতঃ একটি লাল রঙের বৃত্তের মধ্যে প্রদর্শিত হয়।

সোজা যাওয়া নিষেধ/প্রবেশ নিষেধ

'ইউ' বাঁক নিষিদ্ধ

সমস্ত প্রকার যানবাহন নিষিদ্ধ

ওভারটেক করা নিষিদ্ধ

সাইকেল নিষিদ্ধ

হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ

পথচারীর জন্য নিষিদ্ধ

পার্কিং নিষিদ্ধ

ডানদিকে ঘোরা নিষিদ্ধ

গাড়ি রাখা নিষিদ্ধ

বামদিকে ঘোরা নিষিদ্ধ

সীমিত গতি

২. **সর্তকতামূলক ট্রাফিক সংকেত**

এই সংকেত সাধারণতঃ লাল রঙের ত্রিভুজ চিহ্নের মধ্যে প্রদর্শিত হয়।

ডানদিকে ঘোরা

সাইকেলে রাস্তা পার হওয়া

বাম দিকে ঘোরা

হেঁটে রাস্তা পার হওয়া

ডান দিকে তীক্ষ্ম মোড়

সামনে বিদ্যালয়

শ্রমিক কর্মরত

সংকীর্ণ সেতু

নদীঘাট গতি প্রতিরোধক

বিপদপূর্ণ খাল

সামনে হাম্পস্ রয়েছে

৩. সূচনা মূলক ট্রাফিক সংকেত

রাস্তায় চলাফেরার সময় যাত্রীদের কিছু সূচনা দেবার জন্য এই সংকেতগুলি উদ্দিষ্ট। সাধারণতঃ এই সংকেতগুলি রাস্তার পাশে নীল চতুর্ভুজের মধ্যে প্রদর্শিত হয়।

সর্বজনীন দূরভাষ

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র

পেট্রোল পাম্প

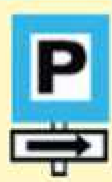

এই দিকে গাড়ি রাখার স্থান

ডাক্তারখানা

আজকাল আমাদের রাজ্যের পুলিশ সংস্থা সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করছে। অপরাধীকে ঘৃণা না করে সে যাতে অপরাধ না করে, সেজন্য তার মানসিক পরিবর্তনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আজকাল জেলের ভিতরে বন্দী অপরাধীর উন্নতির জন্য অনেক সংস্কার মূলক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়াও আমাদের দেশের শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অনেক কর্মজীবী রয়েছেন। শিক্ষক তাঁর জীবনকালে বহু পরিশ্রম করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে রত থাকেন। তাদের নির্মল চরিত্র গঠনে সহায়ক হন তাঁরা। উন্নত মানের শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা তাদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করে বহু দ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে। শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি কর্মজীবী সৃষ্টি হচ্ছে।

উপরে আলোচিত সৈন্য, পুলিশ, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের কার্যগুলি যেমন গুরুত্বপূর্ণ কৃষকের কাজও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন না করলে খাদ্যের অভাব দেখা দেবে। খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনকারী ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের উৎপাদনকারীর ভূমিকাও তদ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- দেশের গমনাগমন ও পরিবহন ক্ষেত্রে অনেক কর্মজীবী কাজ করে। ওরা সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ, আকাশপথে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।
- যোগাযোগ ক্ষেত্রে কার্যরত কর্মচারীদের মধ্যে ডাক ও তার বিভাগ, মোবাইল, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিজন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে যারা কাজ করে সেই কর্মচারীদের কাজের গুরুত্ব অনেক বেশী।
- ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে কাজ করা কর্মজীবীদের সাহায্যে আমরা সহজে অন্য অঞ্চলের জিনিসপত্র আমাদের হাতের কাছে পেয়ে যাই।
- দেশের অভ্যন্তরীন নিয়ম-শৃঙ্খলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণাধীন। সৈন্যরা দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- ট্রাফিক পুলিশ পথচারীরা ও যানবাহনগুলি যাতে নির্বিঘ্নে রাস্তায় যাতায়াত করতে পারে সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখে।
- ট্রাফিক নিয়মাবলী জেনে বুঝে রাস্তায় যাতায়াত করলে দুর্ঘটনা এড়ান যায়।
- শিক্ষক শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরি করেন। অন্য কর্মজীবীদের মত কৃষকদের কাজও গুরুত্বপূর্ণ।

অভ্যাস

১. বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে শূণ্যস্থানে ঠিকমতো বসাও।

ক) .... বাসের মেরামতি করে।
(ড্রাইভার, মেকানিক, কণ্ডাকটার, পাইলট)

খ) লঞ্চ, স্টিমার .... পথে যাতায়াত করে।
(স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ, রাজপথ)

গ) উড়োজাহাজের চালককে .... বলা হয়।
(পাইলট, ড্রাইভার, ক্যাপটেন, কন্ডাকটার)

ঘ) .... রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে।
(পাইলট, ট্রাফিক পুলিশ, ক্যাপটেন, ড্রাইভার)

২. ‘ক’ স্তম্ভে প্রদত্ত কর্মজীবীকে ‘খ’ স্তম্ভের যানবাহনের সঙ্গে তীর চিহ্ন দিয়ে যুক্ত কর।

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
মাঝি	বাস
পরিচারিকা	জলজাহাজ
নাবিক	উড়োজাহাজ
ড্রাইভার	নৌকা
ট্রাফিক পুলিশ	রিক্সা
	ডুবন্ত জাহাজ

৩. কে, কোথায় কি কাজ করে?

কে	কোথায়	কি কাজ করে
পরিচারিকা	____________	____________
হেলপার	____________	____________

৪. তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী কি কি কাজ করেন সে সব কাজ লক্ষ্য কর ও সে সম্পর্কে লেখো।

৫. প্রদত্ত ট্রাফিক সূচনাগুলি কি নির্দেশ করে?

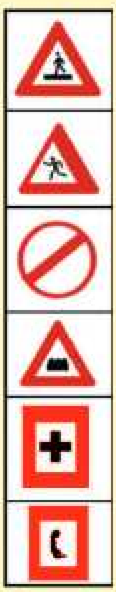

চতুর্থ অধ্যায়

আমাদের দেশ ও আমাদের পৃথিবী

মাস্টারমশাই ছাত্রছাত্রীদের গ্লোব দিয়ে বলবেন, গ্লোবটি দেখ ও সেটিতে যা সব দেখছ লেখো।

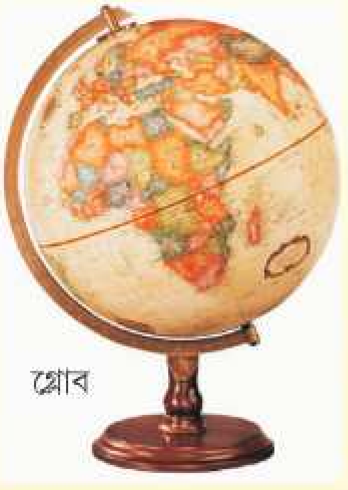

গ্লোব

-
-
-
-

গ্লোবের ঠিক মাঝখানে বিষুব রেখাটি দেখ। এই রেখা পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এই রেখার উপরের অংশকে উত্তর গোলার্ধ ও নীচের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। উত্তর গোলার্ধে আরো অনেক বৃত্ত আঁকা হয়েছে দেখ। বিষুব রেখার দুই পার্শ্বে কিছু দূরে সমান ব্যবধানে এক একটি বৃত্ত দেখতে পাবে। উত্তর ভাগের বৃত্তকে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণ ভাগের বৃত্তকে মকরক্রান্তি বলা হয়। উত্তর গোলার্ধের প্রান্তকে সুমেরু বা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ গোলার্ধের প্রান্তকে কুমেরু বা দক্ষিণ মেরু বলা হয়। সুমেরু নিকটে স্থিত বৃত্তকে সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত নিকটে স্থিত বৃত্তকে কুমেরু বৃত্ত বলা হয়। সুমেরু বৃত্ত থেকে সুমেরু পর্যন্ত ও কুমেরু বৃত্ত থেকে কুমেরু পর্যন্ত অবস্থিত অঞ্চলকে মেরু অঞ্চল বলা হয়।

পৃথিবী

পৃথিবীর উপরে এ সব বৃত্ত দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলি কেবল কল্পনা করে গ্লোবে/মানচিত্রে অঙ্কন করা হয়েছে।

এস, আর একবার গ্লোব দেখা যাক। গ্লোবের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রঙ দেওয়া হয়েছে। এই রঙগুলির মধ্যে নীল রঙ জলভাগকে সূচিত করে। স্থলভাগকে সবুজ, বাদামী, হলুদ রঙ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। বড় বড় জলভাগের অঞ্চলগুলিকে মহাসাগর বা সাগর বলা হয়। গ্লোব দেখে মহাসাগরগুলি চিহ্নিত কর ও সেগুলির নাম লেখো।

১. প্রশান্ত মহাসাগর	২.	৩.
৪.	৫.	৬.

বড় বড় স্থলভাগগুলিকে মহাদেশ বলা হয়। গ্লোব দেখে মহাদেশগুলি চিহ্নিত কর ও নাম লেখো।

১. এশিয়া		২.
৩.	৪.	৫.
৬.		৭.

আবার গ্লোব বা মানচিত্র দেখ। সেখানে মহাদেশ দেখতে পাবে। সেখানে আমাদের দেশ কোথায় চিনিয়ে দাও।

পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র

এবার ভারতের চারপাশে কোন কোন দেশ, সাগর, মহাসাগর আছে চিহ্নিত কর ও সেগুলির নাম নীচে লেখো।

দেশ	সাগর/মহাসাগর

মানচিত্রে আমরা দেখলাম এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগে ভারত অবস্থিত। ভারতের দক্ষিণ অংশ সঙ্কুচিত হয়ে জলভাগে প্রবেশ করেছে। ভারতের তিন ভাগ জল। আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ঘিরে রয়েছে আমাদের দেশ। ভারতের প্রধান স্থলভাগ থেকে আলাদা হয়ে ছোট স্থলভাগটি অবস্থান করছে বঙ্গোপসাগরে। তার নাম আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। স্থলভাগের চারপাশে জলভাগ থাকায় একে দ্বীপ বলা হয়। বহুসংখ্যক দ্বীপের সমারোহকে বলা হয় দ্বীপপুঞ্জ। তেমনি ভারতের স্থলভাগের আর একটি অংশ আরব সাগরে আছে। তার নাম লাক্ষাদ্বীপ।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- পৃথিবীর উত্তর প্রান্তকে উত্তরমেরু বা সুমেরু, দক্ষিণ প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলা হয়।
- একটি কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। সেই কাল্পনিক রেখাকে বিযুব রেখা বলা হয়।
- বিযুব বৃত্ত থেকে সমান দূরত্বে উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তি ও দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গিয়েছে।
- গ্লোবে নীল রঙের অংশ জলভাগ এবং সবুজ, বাদামি, হলুদ প্রভৃতি রঙের অংশ স্থলভাগ।
- পৃথিবীর ৫টি মহাসাগরের নাম - প্রশান্ত মহাসাগর, অ্যাটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।
- পৃথিবীর মহাদেশগুলি হল - এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও আন্টারকটিকা।
- আমাদের দেশ ভারত এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এর তিনদিকে জলভাগ ঘিরে রয়েছে। (বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর, আরব সাগর)
- ভারতের এক অংশ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, বঙ্গোপসাগরের মধ্যে রয়েছে।
- আর একটি অংশ লাক্ষাদ্বীপ, আরব সাগরে আছে।
- ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির নাম - পাকিস্থান, চীন, নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, মিয়াঁমার ও শ্রীলঙ্কা।

অভ্যাস

১. কুঠরি মধ্যে ঠিক উত্তরটি একটি অথবা দু'টি শব্দে লেখো ঃ

ক) ভারত কোন মহাদেশের অন্তর্গত ?

খ) মকরক্রান্তি কোন গোলার্ধে আছে ?

গ) কর্কটক্রান্তি কোন গোলার্ধে আছে ?

ঘ) কোনটি ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশ ?

ঙ) পৃথিবীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা কাল্পনিক রেখাটির নাম কি ?

চ) কোন রঙটি গ্লোবে জলভাগ নির্দেশ করছে ?

ছ) গ্লোবে সুমেরুর দক্ষিণ দিকে কোন বৃত্ত আছে ?

২. আমাদের পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির নাম লেখো।

মহাদেশ	মহাসাগর

৩. নিম্ন প্রদত্ত চিত্রে মকরক্রান্তি, কর্কটক্রান্তি, সুমেরু, বিষুবরেখা, কুমেরু বৃত্ত, সুমেরু বৃত্তের নাম লেখো।

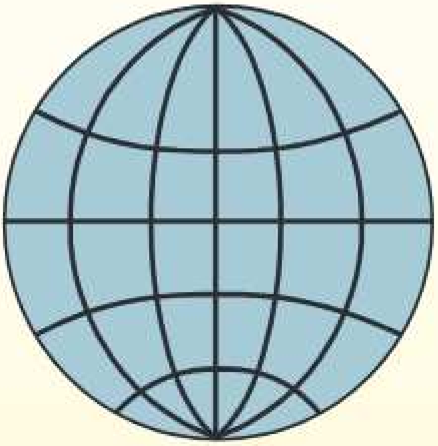

৪. ভারতের সীমা সন্নিকটস্থ দেশের নাম, সাগরের নাম ও মহাসাগরের নাম লেখো।

দেশ	সাগর/মহাসাগর

৫. পৃথকটি বেছে পাশের কুঠরিতে লেখো।

ক) বিষুবরেখা, মকরক্রান্তি, সুমেরু, সুমেরু বৃত্ত।

খ) ইউরোপ, আফ্রিকা, পাকিস্থান, অস্ট্রেলিয়া।

গ) চীন, মিয়াঁমার, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড।

৬. শূণ্যস্থান পূরণ কর।

ক) পৃথিবীতে ....টি মহাদেশ আছে।

খ) পৃথিবীতে ....টি মহাসাগর আছে।

গ) ভারতের দক্ষিণ দিকের মহাসাগরের নাম ....।

ঘ) পৃথিবীর জল প্রায় ....টি ভাগ ও স্থল প্রায় ....।

ঙ) পৃথিবীতে .... টি মহাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত।

চ) ভারতের দক্ষিণ দিকের মহাসাগরের নাম ....।

৭. ভূগোলক দেখে নীচের তালিকাতে কোন মহাদেশ কোন গোলার্ধে আছে লেখো ও কোন মহাদেশ উভয় গোলার্ধে আছে লেখো।

গোলার্ধ	মহাদেশ
উত্তর গোলার্ধ	
দক্ষিণ গোলার্ধ	
উভয় উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ	

বাড়িতে বসে কর ঃ

- মাটির গ্লোব তৈরি করে তাতে দু'টি ক্রান্তি বৃত্ত এবং বিষুব রেখা দেখাও ও রঙ দাও।
- তোমার অঞ্চলের জিনিস দিয়ে একটি গ্লোব তৈরি করে দু'টি অর্দ্ধবৃত্ত, দু'টি ক্রান্তি বৃত্ত ও বিষুব রেখা ও ২টি মেরু দেখাও।

পঞ্চম অধ্যায়

আমাদের দেশের ভূমিরূপ ও জলবায়ু

'ক' আমাদের দেশের ভূমিরূপ

পিঙ্কু নতুন অ্যাটলাসটি মনের খুশিতে দেখছিল। অ্যাটলাস দেখতে দেখতে ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রটি সে দেখতে পেল। সে বিস্ময়ের সুরে বাবার কাছে জানতে চাইল "বাবা" এই মানচিত্রে সবুজ, হালকা বাদামী, হলুদ, নীল এ প্রকার এতগুলি রঙ দেওয়া হয়েছে কেন? বাবা বুঝিয়ে বলল, পিঙ্কু আমাদের ভারতের ভূমিরূপ সব অঞ্চলে সমান নয়। এ সব ভূমিরূপ মানচিত্রে চিহ্নিত করার জন্য বিভিন্ন রঙ দেওয়া হয়েছে। যেমন —

ভূমিরূপ	রঙ
সমতলভূমি	সবুজ রঙ
মালভূমি	হালকা বাদামী
পার্বত্যভূমি	বাদামী
মরুভূমি	হলুদ
জলভাগ	নীল
উচ্চ অঞ্চল	গাঢ় বাদামী

নীচের মানচিত্রটি ভালোভাবে দেখ। রং দেওয়া সংকেত অনুসারে ভূমিরূপ গুলির অবস্থান নির্ণয় কর।

(ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র)

এই মানচিত্র দেখে আমরা জানলাম ভারতকে মূলত ৬টি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেগুলি হল —

১. উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল

২. উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল

৩. মালভূমি অঞ্চল

৪. পশ্চিমস্থ মরুভূমি অঞ্চল

৫. উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল

৬. দ্বীপসমূহ

এবার আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক অঞ্চল বিষয়ে জানা যাক।

১. উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল

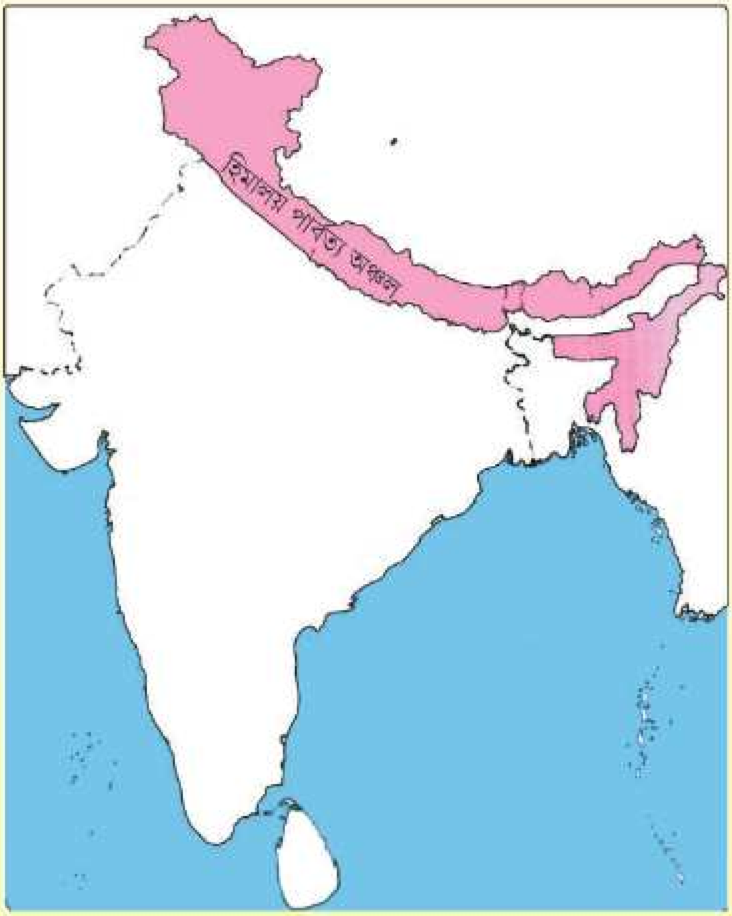

মানচিত্র দেখে নীচের খালি ঘর পূরণ কর। উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য ও প্রবাহিত প্রধান নদীগুলির নাম লেখো।

রাজ্য —

প্রধান নদী —

মানচিত্র দেখে আমরা জানলাম, ভারতের উত্তর দিক ঘিরে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল। তার মধ্যে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল প্রধান। উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমের কাশ্মীর থেকে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত প্রাচীরের মত লম্বা হয়ে রয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৪০০-৫০০ কিলোমিটার। সারি সারি দিয়ে দাঁড়ান লম্বা পর্বতগুলিকে বলা হয় পর্বতমালা। পর্বতগুলির মাঝখানে আবার কোথাও কোথাও ছোট বড় চওড়া ধরণের সমতল অঞ্চল দেখতে পাওয়া যায়, তাকে পার্বত্য উপত্যকা বলা হয়। সে জায়গায় ভাল চাষ হয় বলে সেখানে অনেক লোকবসতি দেখা যায়। তাদের মধ্যে কাশ্মীর, দেরাদুন অন্যতম।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের ভেষজ উদ্ভিদ ও বিভিন্ন শ্রেণীর পশু-পক্ষী দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করে বলে তোমার ধারণা বল এবং লেখো।

উত্তরের হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল সমুদ্রতল থেকে অনেক উপরে হওয়ার ফলে এখানে সারাবছর অনেক বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয়। হিমালয়স্থ K_2 (গডউইন অষ্ট্রিন), কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী শৃঙ্গের শীর্ষভাগ সারা বছর বরফে ঢেকে থাকে। এই অঞ্চলের বরফ গলে নদীরূপে প্রবাহিত হয়। যথাঃ গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদী। এ জন্য এগুলো চির প্রবাহিত নদী। এই পার্বত্য অঞ্চলে জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, সিকিম, অরুণাচল, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি রাজ্যগুলি অবস্থিত। মানচিত্র দেখে এই রাজ্য ও নদীগুলি চিহ্নিত কর।

২. উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল ঃ

মানচিত্র দেখে উত্তরস্থ সমতল অঞ্চলে অবস্থিত রাজ্য ও প্রবাহিত নদীর নাম লেখো ঃ

রাজ্য	
নদী	

এই মানচিত্র দেখে আমরা জানতে পারি উত্তরস্থ সমতল অঞ্চলের উত্তরে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল ও দক্ষিণে মালভূমি অঞ্চল অবস্থিত। এটি ভারতের বৃহত্তম সমতল অঞ্চল। এর পশ্চিমে পাঞ্জাব থেকে পূর্বে গঙ্গা নদীর ত্রিকোণভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য এই সমতল অঞ্চলে অবস্থিত। এগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং এর পূর্ব-পশ্চিম দিক লম্বাটে। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও অনেক ছোট বড় নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। হিমালয় থেকে বেরোনো নদীগুলি এই অঞ্চল দিয়ে বয়ে যাওয়ার ফলে এই অঞ্চলের মাটি উর্বর ও চাষোপযোগী। এই সব অঞ্চলে বহু লোকের বসতি রয়েছে।

৩. মালভূমি অঞ্চল ঃ

মানচিত্র লক্ষ্য করলে আমরা দেখব উত্তরস্থ সমতল অঞ্চলের দক্ষিণ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মালভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের আকার প্রায় ত্রিভুজের মত। এর তিনদিক ঘিরে রয়েছে বিশাল সমতল ভূমি। এ অঞ্চলের ভূমি উচ্চ ও পাহাড়িয়া। কয়েকটি স্থানে রয়েছে পর্বতশ্রেণীর আকর্ষণ। মালব মালভূমি, ছোটনাগপুর মালভূমি এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা তেলেঙ্গানা মালভূমি নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

এই মালভূমি পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে ঢালু। সুতরাং পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণী থেকে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীগুলি বেরিয়ে বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে। নর্মদা ও তাপ্তি নদী আরব সাগরে মিশেছে।

এই অঞ্চল মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে।

৪. পশ্চিমস্থ মরুভূমি অঞ্চল ঃ

মরুভূমিতে কাঁটা গাছ

উটেকরে লোকেদের যাত্রা

বালি পাহাড়

প্রদত্ত চিত্র ও ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখে পশ্চিমস্থ মরুভূমি বিষয়ে যা জানতে পেরেছ লেখো।

আমরা জানলাম, আমাদের দেশের পশ্চিম সীমার পাশেই পশ্চিমস্থ মরুভূমি অবস্থিত। এটি মরুভূমি অঞ্চল বলে চারদিক বালিতে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশের বৃহত্তম মরুভূমি, থর মরুভূমি এই অঞ্চলে অবস্থিত। রাজস্থানের পশ্চিমভাগে রয়েছে এই মরু অঞ্চল। এই অঞ্চলে মাঝে মাঝে বালুকা ঝড় হয়। নদী নালা এ অঞ্চলে নেই। বৃষ্টি খুব কম হয়। তাই চাষোপযোগী নয়। তথাপি আজকাল পাঞ্জাবের নদী থেকে কেনালের মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করে এখানে কৃষিকাজ করা হচ্ছে।

৫. উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল ঃ

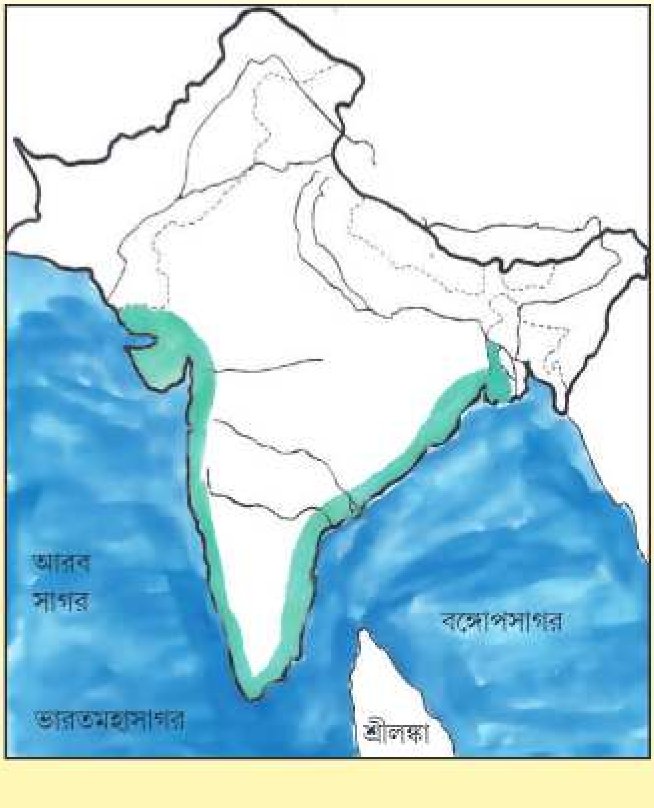

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্রে উপকলস্থ সমতল অঞ্চল দেখে নীচের তালিকা পূরণ কর।

উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল দেশের কোন অংশে অবস্থিত	এই অঞ্চলে কোন কোন রাজ্য আছে	পূর্বউপকূলস্থ রাজ্য সমূহ	পশ্চিম উপকূলস্থ রাজ্য সমূহ
পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত			

আমরা মানচিত্র দেখে জানতে পারি, উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ও পশ্চিমে কেরল থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব উপকূলের সমতল অঞ্চলকে পূর্ব উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল ও পশ্চিম উপকূলের সমতল অঞ্চলকে পশ্চিম উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল বলা হয়।

পূর্ব উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল মহানদী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর ত্রিভুজ আকৃতিতে রয়েছে। এই ত্রিকোণ আকৃতির অঞ্চলে কৃষিকাজ ভাল হয়। পশ্চিম উপকূলস্থ সমতল অঞ্চলটি অপ্রশস্ত। এই অঞ্চল দিয়েও নর্মদা, তাপ্তী ও ফেরিয়ার ইত্যাদি নদী প্রবাহিত।

৬. দ্বীপ সমূহ ঃ

ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র দেখে পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বাক্সে সাগর ও দ্বীপগুলির নাম লেখো।

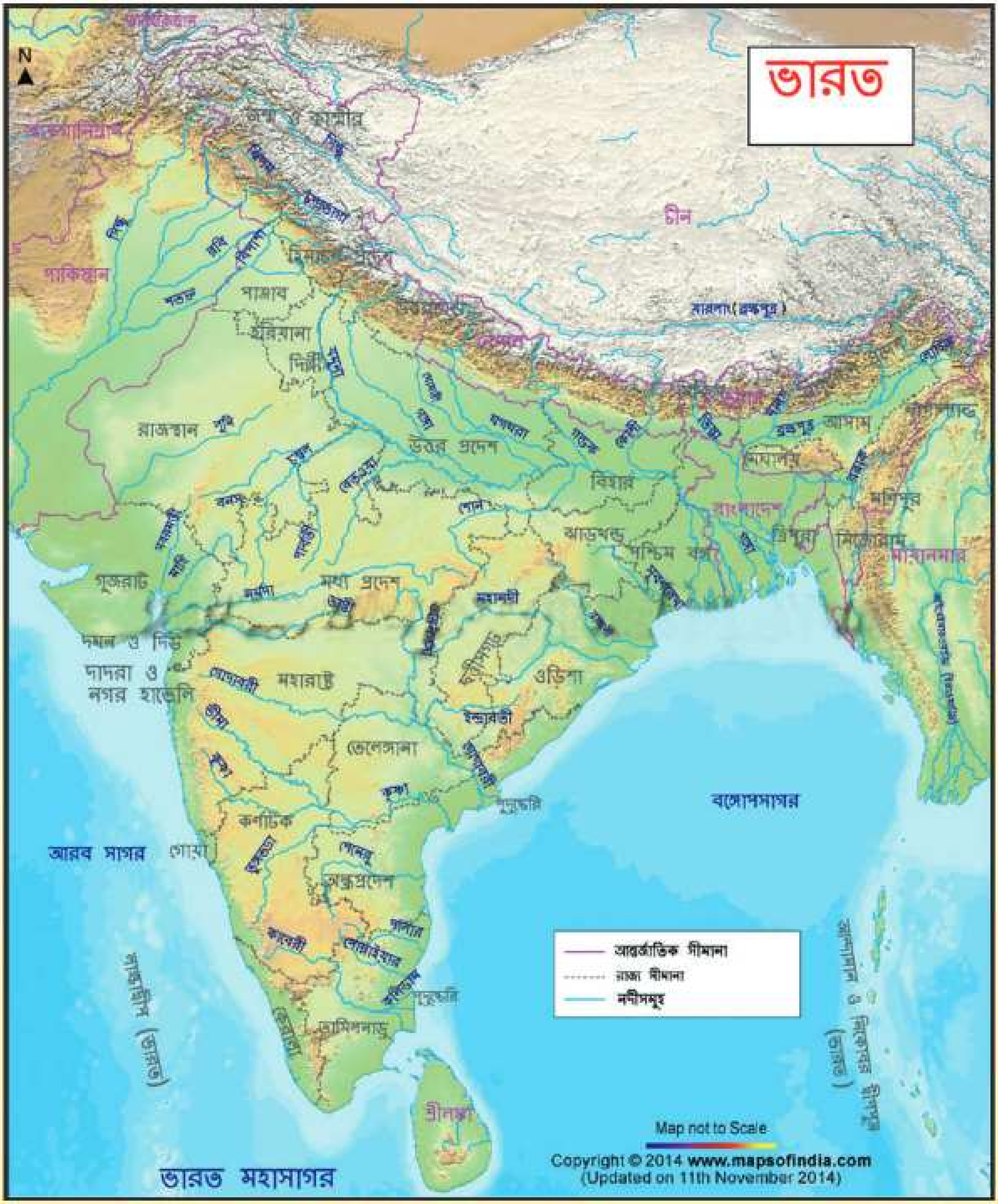

আমরা জানলাম যে আমাদের দেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমদিকে আরবসাগর ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অনেক ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। এগুলির নাম আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপগুলি জঙ্গল ও পাহাড় পর্বতে পূর্ণ। এই দ্বীপগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নারকেল ও সুপুরি চাষ হয়।

বঙ্গোপসাগরের মত আরবসাগরেও ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে। এদের বলা হয় লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপপুঞ্জের মাটি যদিও সমতল কিন্তু উর্বর নয়। তাই এখানের অধিবাসীরা মুখ্যতঃ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

তুমি জান কী ?

আমাদের দেশের লাগোয়া বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে ৩০০টি দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। তাদের মধ্যে ২০টিতে মানুষ বসবাস করে।

গ) আমাদের দেশের জলবায়ু ঃ

শীতঋতু

বর্ষাঋতু

গ্রীষ্মঋতু

সব সময় আবহাওয়া সমান থাকে না। কখনো রোদ বা কখনো বৃষ্টি। আবার কখনো বা শীত। একটি অঞ্চলের অনেক বছর ধরে আবহাওয়ার মোটামুটি একই অবস্থাকে সে অঞ্চলের জলবায়ু বলা হয়। আমাদের দেশের প্রাকৃতিক গঠনের ভিন্নতার দরুণ সর্বত্র জলবায়ু এক প্রকার হয় না। প্রাকৃতিক গঠন ছাড়াও আরও অনেক কারণ জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সেগুলো কি হতে পারে ভেবে বল।

ভারত এক বিশাল দেশ। এখানে ভূমিরূপ বিভিন্ন প্রকারের। স্বভাবতই জলবায়ু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের হয়। কিছু অঞ্চলে অত্যধিক শীত হয় আবার কিছু অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টি হয়। ভারতের অবস্থিতিও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। ভারতের উত্তরের হিমালয় পর্বতমালা, সুমেরু অঞ্চল থেকে আসা অত্যধিক শীতল বাতাসকে বাধা দিয়ে ভারতকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা করে। অতএব ভারতে চীন ও রাশিয়ার মত ঠান্ডা পড়ে না।

ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ তিন দিকেই সমুদ্র রয়েছে। সমুদ্র সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে শীতের প্রকোপ কম। সমুদ্রের শীতল বায়ু এ অঞ্চলের অধিবাসীদের গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে রক্ষা করে। ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বায়ুমন্ডল নাতিশীতোষ্ণ ধরণের হয়।

সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের প্রভাব পড়ে না। সুতরাং সেই অঞ্চলে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়। যথাঃ ওড়িশার সম্বলপুর, বলাঙ্গীর ও রাউরকেল্লা, দিল্লী, হরিয়ানা,রাজস্থান প্রভৃতি স্থানে এই প্রকার অসহ্য গরম অনুভূত হয়। সমুদ্র পত্তন থেকে অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত অঞ্চলগুলির জলবায়ু কনকনে ঠান্ডা। অতিশয় ঠান্ডা অনুভূত হয় দারিঙ্গবাড়ি, উটি, মুসৌরি প্রভৃতি স্থানে। এসব স্থান গ্রীষ্মনিবাস নামে সুপরিচিত।

ভারতে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা কমে যায়। মেঘালয়ের মাইসিন্‌রামে সর্বাধিক বৃষ্টি হয়

ও থর মরুভূমিতে সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়। সাধারণত মালভূমি অঞ্চলে গরম ও শীত বেশী হয়। এ ছাড়া সূর্যতাপের জন্যও জলবায়ুর পার্থক্য দেখা দেয়। আমাদের দেশে বছরের বেশি সময় গরম ও কম সময় শীত হয়। এজন্য আমাদের দেশকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ বলা হয়।

তোমার কাজ ঃ

তোমার অঞ্চলে জলবায়ু কেমন থাকে ও কেন এমন হয় তার কারণ লেখো।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- প্রাকৃতিক মানচিত্রে বিভিন্ন ভূমিরূপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়। যথাঃ সমতল ভূমি - সবুজ, পার্বত্য ভূমি - গাঢ় বাদামী, মালভূমি - হালকা বাদামী, মরুভূমি - হলুদ, জলভাগ - নীল।
- ভূমিরূপ অনুসারে আমাদের দেশ ৬টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলি হল ঃ উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল, মালভূমি অঞ্চল, পশ্চিমস্থ মরুভূমি অঞ্চল, উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল ও দ্বীপসমূহ।
- উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলি সারা বছর জলে পূর্ণ থাকে।
- উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রবাহিত নদীগুলির বয়ে আনা পলিমাটিতে উত্তরস্থ সমতল অঞ্চল গঠিত।
- কোন অঞ্চলের অনেক বছর ধরে জলবায়ুর মোটামুটি একই অবস্থা থাকলে, বায়ুমন্ডলের সেই অবস্থাকে সেই অঞ্চলের জলবায়ু বলা হয়।

অভ্যাস

১. খালি স্থানে উত্তর লেখো।

ক) আরব সাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ

খ) ভারতের বৃহত্তম মরুভূমি

গ) বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ

ঘ) ওড়িশার গ্রীষ্মনিবাস

২. **ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো।**

ক) সারি সারি পর্বতের মাঝখানে যে সমতল ভূমি দেখা যায় তাকে মরুভূমি বলা হয়।

খ) গঙ্গানদীর উৎস পশ্চিমঘাট পর্বতমালা সেজন্য এই স্থান সারা বছর জলমগ্ন থাকে।

গ) ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে মরুভূমি দেখা যায়।

৩. 'ক' স্তম্ভে কয়েকটি জঙ্গলের নাম লেখা রয়েছে, 'খ' স্তম্ভে ভূমিরূপের নাম লেখা রয়েছে। ভূমিরূপের সঙ্গে সম্পর্কিত জঙ্গল কে যুক্ত কর।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
সবুজ	পার্বত্যভূমি
হলদে	জলভাগ
গাঢ় বাদামী	সমতলভূমি
নীল	মালভূমি
হালকা বাদামী	মরুভূমি
	উচ্চভূমি

৪. শূণ্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) মহানদী .... পর্বতশ্রেণী থেকে বেরিয়েছে।

খ) পশ্চিমঘাট পর্বতমালা .... অঞ্চলে অবস্থিত।

গ) উত্তরস্থ থর মরুভূমি .... রাজ্যে অবস্থিত।

ঘ) সুমেরু অঞ্চল থেকে .... বায়ু প্রবাহিত হয়।

ঙ) তাপ্তি নদী .... সাগরে মিশেছে।

চ) ছোটনাগপুর মালভূমির ভূমিরূপ ....।

৫. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

ক) পার্বত্য উপত্যকা কাকে বলে ?

খ) উত্তরস্থ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল কেন বরফাবৃত থাকে ?

গ) উত্তরস্থ সমতল অঞ্চলের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য করে জীবিকা নির্বাহ করে, কারণ কি ?

ঘ) দক্ষিণস্থ মালভূমিতে কোন কোন রাজ্য রয়েছে ?

ঙ) পশ্চিম উপকূলস্থ সমতল অঞ্চল কোন স্থান থেকে কোন স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ?

চ) দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা প্রধানত মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে কেন ?

বাড়িতে বসে কর ঃ

একটি মাসের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা লিখে রাখ ও শ্রেণীকক্ষে তা প্রদর্শন কর।
(খবর কাগজ বা দূরদর্শনের সাহায্য নাও)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও শিক্ষা

রহিম ঃ বাবা, এখানে কেন একথা লেখা হয়েছে?

বাবা বলল ঃ জঙ্গল এক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। জঙ্গল আমাদের অনেক উপকার সাধন করে। সেজন্য একথা লেখা হয়েছে।

রহিম জানতে চাইল ঃ আর কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের দেশে আছে?

বাবা বলল ঃ এবার আমরা সে সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করব।

জঙ্গল সম্পদ ঃ

জঙ্গল এক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা জঙ্গল থেকে জ্বালানি, বাড়ি তৈরির সামগ্রী, বাড়ির উপকরণ, ওষুধ, খাদ্য সামগ্রী, সৌখিন দ্রব্য, নিত্য ব্যবহার্য পদার্থ ও বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল ইত্যাদি পাই। আমাদের দেশের অন্ধ্র, ওড়িশা, বিহার, কর্ণাটক,

পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে প্রচুর জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের কর্ণাটকের চন্দন কাঠ পৃথিবী প্রসিদ্ধ। বনাঞ্চল পরিবেশ প্রদূষণ থেকে রক্ষা করে, বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে ও মৃত্তিকা সংরক্ষণে সহায়ক হয়। পরিবেশের উন্নতির জন্য জঙ্গল সৃষ্টি করা ও তার বিনাশ সাধন নয়, রক্ষণাবেক্ষণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকার অরণ্য দেখা যায়। মেহেগানি, ইবোনি, রোজউড়, শিশু ইত্যাদি বৃক্ষের অরণ্য প্রধানতঃ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল ও পশ্চিমঘাট পর্বতে দেখা যায়। নীচের তালিকায় বৃক্ষের নাম ও অঞ্চলের নাম দেওয়া হল।

বৃক্ষের অরণ্য	অঞ্চলের নাম
মেহেগানি, ইবোনি, রোজউড	আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল, পশ্চিমঘাট পর্বতমালা
শাল, পিয়াশাল, শেগুন, চন্দন	ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক, বিহার
অশত্থ, নিম, শিশু চন্দন	ঝাড়খন্ড, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক
মনসা গাছ, খেজুর গাছ, নাগকেশর বৃক্ষ, বাবলা	রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, কর্ণাটক
কাঁটাওয়ালা গাছ	মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান
চির, পাইন, দেওদারু	জম্মুকাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড
তালগাছের বন	ওড়িশার ভিতর কণিকা, আন্দামান নিকোবর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন

রহিম ঃ বাবা, জঙ্গল বিষয়ে ত বললে। আমাদের দেশের অন্য সম্পদের কথা ত বললে না?

বাবা ঃ তাহলে বলি শোন, আমাদের দেশের অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ হল মৃত্তিকা সম্পদ, জল সম্পদ, পশু সম্পদ, খনিজ সম্পদ। এই সব সম্পদ প্রয়োগ করার মত সম্পদ হচ্ছে মানব সম্পদ। এবার এই সব সম্পদ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

মৃত্তিকা সম্পদ ঃ

মাটি আমাদের কি কি কাজে লাগে?

কৃষিকর্ম, গৃহ উপকরণ প্রস্তুতি, গৃহ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, শিল্প কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি অনেক কাজের জন্য মাটি একান্ত দরকার। কাজেই মাটি বা মৃত্তিকা এক মূল্যবান সম্পদ। মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। নীচের সারণী থেকে আমরা বিভিন্ন রকমের মাটি বিষয়ে কিছু জানতে পারব।

মৃত্তিকা	যে অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়	ফসলের নাম
উর্বর মৃত্তিকা	নদী উপত্যকা, ত্রিকোণ ভূমি, উপকূলবর্তী সমতল অঞ্চল	ধান, গম, পাট, ইক্ষু
এটেল মাটি	মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু	কার্পাস চাষ
বেলে মাটি	সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল	নারিকেল চাষ
লালমাটি ও হল্‌দে মাটি	দক্ষিণস্থ মালভূমির কিছু অঞ্চল	জনার, চিনাবাদাম

জঙ্গলের বিনাশ ও প্রচুর বৃষ্টি পাতের ফলে মাটির ক্ষয় হয়। মাটির সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ একান্ত আবশ্যক

জল সম্পদ ঃ

জল এক মূল্যবান সম্পদ।
তোমার অঞ্চলে জলের উৎস কি লেখো।

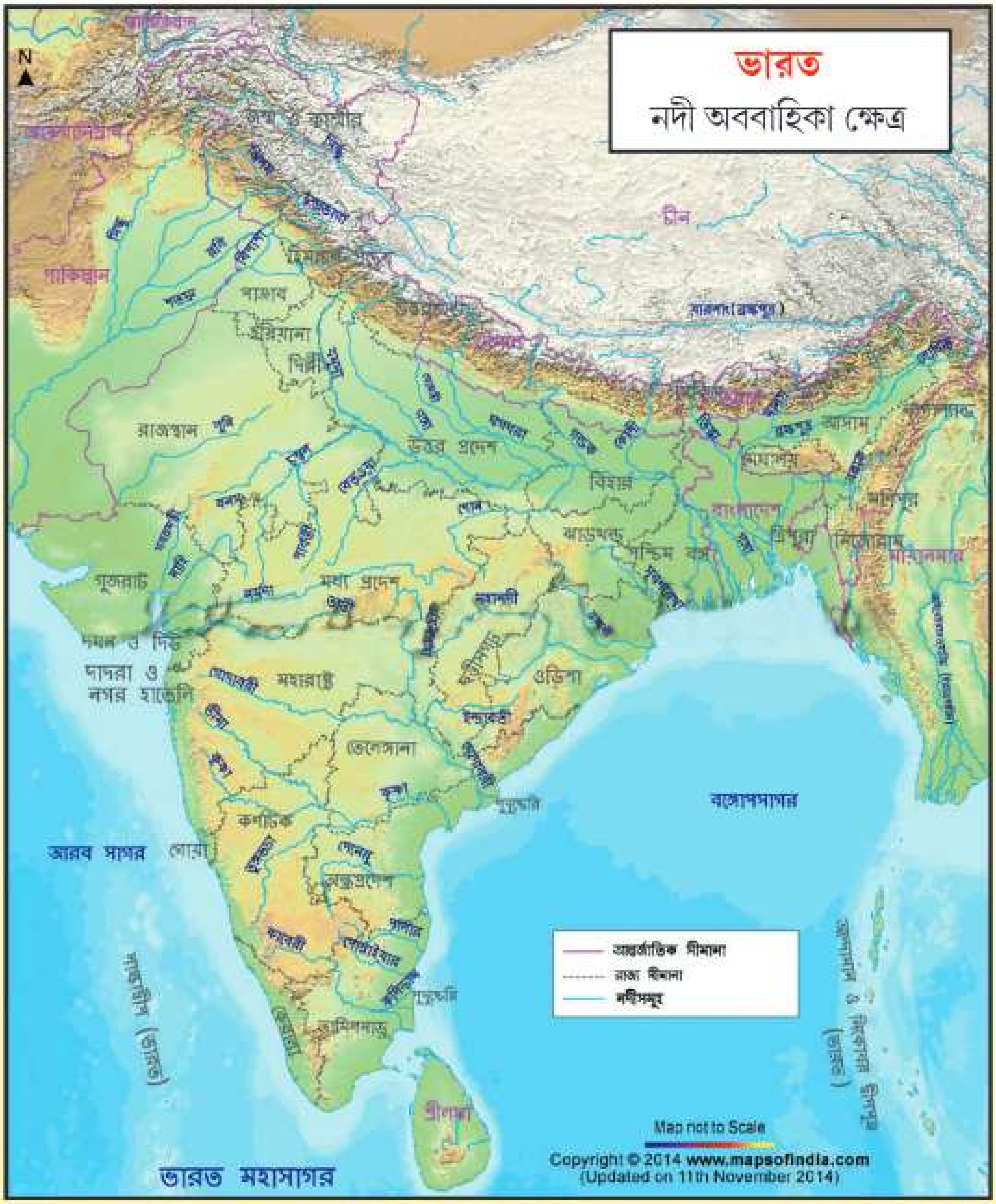

ভারতের প্রধান নদীসমূহের মানচিত্র

কৃষিকর্ম, কলকারখানা, গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজের জন্য জল একান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের বড় বড় নদী গুলি হল - মহানদী, ঋষিকুল্যা, বৈতরণী, সুবর্ণরেখা, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী ইত্যাদি। আজকাল মাটির নীচের জল কুঁয়া ও নলকূপ দ্বারা উপযোগী করা হচ্ছে। অনেক সময় গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড সূর্যতাপে কুঁয়া ও নলকূপের জল শুকিয়ে যায়। জল সম্পদের অপব্যবহার বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া দরকার।

পশু সম্পদ ঃ

ভারতে অনেক রকমের পশুপক্ষী দেখতে পাওয়া যায়। দেশের অনেক লোক গরু ও মহিষ পালন করে। জম্মু ও কাশ্মীরে ভেড়া পালন করা হয়। গুজরাটে সিংহ, আসামে গণ্ডার ও হাতী, ওড়িশা, কেরল ও কর্ণাটকে হাতী দেখতে পাওয়া যায়। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশে বাঘ দেখা যায়। হিমাচলপ্রদেশে চমরী গাভী দেখা যায়। লোকেরা ইচ্ছেমত পশু শিকার করার ফলে জঙ্গলে পশুপক্ষীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। তুমি কি জান, আজকাল পশুপক্ষী শিকার করা অপরাধ। আজকাল পশুপক্ষীদের সুরক্ষার জন্য "অভয়ারণ্য" প্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন —

উত্তরাখন্ডের জিম কর্বেট জাতীয় পার্ক	ব্যাঘ্র প্রকল্প
রাজস্থানের ভরতপুর	পক্ষী অভয়ারণ্য
আসামের কাজিরঙ্গা	এক শিং বিশিষ্ট গন্ডার অভয়ারণ্য
গুজরাটের গিরঅরণ্য	সিংহ অভয়ারণ্য
ওড়িশার চন্দকা	হাতী অভয়ারণ্য

ওড়িশাতে আর কি কি অভয়ারণ্য আছে নীচে লেখো।

খনিজ সম্পদ ঃ

আমাদের দেশে মাটির নীচে কোথাও পাথর কয়লা ত কোথাও বিভিন্ন ধাতু ও কোথাও আবার জ্বালানি গ্যাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, সিসা, রূপা, তামা, দস্তা, অভ্র, জিপ্‌সম্, খনিজ তৈল ইত্যাদি খনিজ দ্রব্য আমাদের দেশে পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের লোহা পাথর খনিগুলি প্রধানতঃ বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে আছে। বিহারের মুনিষাবগি ও রাজস্থানের ক্ষত্রী নিকটে তামা খনি আছে। ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগ, বিহারের গয়া ও মুঙ্গের জেলাতে এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর ও গুড়র সন্নিকটে অভ্র খনি আছে। মহারাষ্ট্রের নাগপুর, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, ঝাড়খন্ডের সিংভূমে ম্যাঙ্গানিজ খনি আছে। আসামের ডিগবোই -এ তেল খনি আছে। মুম্বাই সমুদ্র থেকে তেল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের দেশীয় খনিজ সম্পদগুলি উপযোগ করতে পারলে দেশের উন্নতি হবে।

রহিম ঃ বাবা, তুমি আমায় জঙ্গল সম্পদের কথা বললে। কিন্তু মানব কিভাবে সম্পদ রূপে গণ্য হল বললে না ত ?

বাবা ঃ রহিম, মানব সম্পদ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলছি মন দিয়ে শোন, তাহলে বুঝতে পারবে।

মানব সম্পদ ঃ

আমাদের যত সম্পদ আছে তার উপযুক্ত বিনিয়োগ করে একমাত্র মানুষ। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদগুলি মানুষ তার বুদ্ধি বলে বিভিন্ন কাজে লাগায়। প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও উপযুক্ত উপযোগের ফলে দেশ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। এ সব সম্ভব মানুষের গুণে। অতএব মানুষ আমাদের দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। উপযুক্ত শিক্ষা, তালিমের মাধ্যমে সুস্থ ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা আবশ্যক।

রহিম ঃ হ্যাঁ বাবা, মানব সম্পদ সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বাবা, মামা বাড়ি আর কত দূর ?

বাবা ঃ জঙ্গল পার হয়ে আমরা ধানবিল দিয়ে যাওয়ার রাস্তায় এসে গেছি। এই ধানবিল শেষ হলেই মামার শহর।

রহিম ঃ বাবা, এখানে ত লোকেরা ধানক্ষেতে কাজ করছে। যেদিকেই তাকাই সেদিকেই খালি ধানক্ষেত। আমাদের দেশে কি কেবল ধান চাষ হয় ?

বাবা ঃ আমাদের দেশের জমি-জায়গা ও জলবায়ু সর্বত্র সমান নয়। সে জন্য আমাদের দেশে সব স্থানে এক প্রকার ফসল হয় না। সাধারণতঃ কোন অঞ্চলের ফসল সেই জমির মাটি ও জলবায়ুর উপরে নির্ভর করে।

আমাদের দেশের প্রধান ফসল ঃ

তোমার অঞ্চলে কি কি ফসল চাষ হয় লেখো।

আমাদের দেশের প্রধান ফসলগুলি হল - ধান, গম, কার্পাস, পাট, চা, চিনাবাদাম, নারিকেল ও আখ।

রহিম ঃ বাবা, ওই ফসলগুলি কোন অঞ্চলে ভাল হয় ?

বাবা ঃ বললেন....

ধান ঃ

ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে ধান। আমাদের দেশের মধ্যে ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে ধান চাষ ভাল হয়।

গমঃ

ধানের পরে গম আমাদের দ্বিতীয় কৃষিজাত সম্পদ। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে প্রচুর পরিমাণে গম চাষ করা হয়।

কার্পাস ঃ

এটা এক অর্থকরী ফসল। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, কর্ণাটিক রাজ্যে এই চাষ হয়।

পাট ঃ

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা ও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে পাট চাষ হয়।

চা ঃ

আমাদের দেশে আসাম রাজ্যে সবচেয়ে বেশি চা চাষ করা হয়। আসাম ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটিক, কেরল ও সিকিমে চা চাষ করা হয়। চা গাছের পাতা গুঁড়ো করে চা প্রস্তুত করা হয়।

চিনাবাদাম ঃ

আমাদের দেশে সরষে, তিল, অলসি, ত্ররণ্ড ইত্যাদি তৈলবীজের মধ্যে চিনাবাদাম প্রধান। আমাদের দেশে তামিলনাড়ুতে সর্বাধিক চিনাবাদাম চাষ হয়। এ ছাড়া মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশাতে চিনাবাদাম চাষ হয়। চিনাবাদাম বীজ থেকে বাদাম তেল প্রস্তুত হয়।

ডালজাতীয় ফসল ঃ

ডালি জাতীয় ফসলের মধ্যে মুগ, বিরি, মুসুর, অড়র, খেসারি, বুট প্রধান। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও ওড়িশায় বিভিন্ন প্রকার ডালিজাতীয় শস্য চাষ করা হয়। আমাদের দেশে ডালিজাতীয় ফসল যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদন হওয়া দরকার।

নারিকেল ঃ

সাধারণতঃ উপকূলবর্তী অঞ্চলে নারিকেল ফলন বহুল পরিমাণে হয়। কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও ওড়িশায় এই চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়।

ইক্ষু ঃ

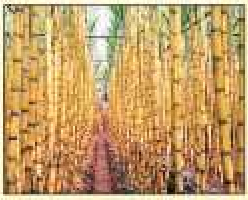

আমাদের দেশের উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার ও ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে এই চাষ বেশি হয়। উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক আখ চাষ হয়।

আমাদের দেশের শিল্প ঃ

রহিম ঃ বাবা, ওখানে এত বড় বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে ও চিমনি থেকে ধূঁয়া বেরচ্ছে, ওখানে কি আছে?

বাবা ঃ ওটা একটা লোহার কারখানা।

রহিম ঃ ওতে কি হয়?

বাবা ঃ ওখানে লোহা পাথর গলিয়ে লোহার সাথে ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমিয়াম মিশিয়ে ইস্পাত তৈরি

করা হয়। আমাদের রাজ্যের রাউরকেল্লাতে একটি ইস্পাত কারখানা আছে। ছত্রিশগড়ের ভিলাই, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, ঝাড়খন্ডের বোকারো ও জামসেদপুর, তামিলনাড়ুর সালেম, অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপট্টনম, কর্ণাটকের ভদ্রাবতী, বিজয়নগরে লৌহ ইস্পাত কারখানা আছে।

রহিম ঃ বাবা, আমাদের দেশে কি কেবল লৌহ ইস্পাত কারখানা আছে?

বাবা ঃ না, না রহিম, আমাদের দেশে লৌহ ইস্পাত ব্যতীত অন্য যে সব শিল্প আছে, তা বলছি শোন।

বয়ন শিল্প / তাঁত শিল্প ঃ উত্তরপ্রদেশের কানপুর, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, গুজরাটের সুরট, মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়ার, রাজস্থানের জয়পুর ও পাঞ্জাবের অমৃতসরে এই শিল্প আছে।

পশম শিল্প ঃ পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের কানপুর ও গুজরাটের উদোদরাতে এই শিল্প আছে।

রেশম শিল্প ঃ অমৃতসর, লুধিয়ানা, কাশ্মীর ও মহীশূর - এ সব রাজ্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে।

পাটশিল্প ঃ পশ্চিমবঙ্গের টিটাগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশাতে আছে।

কাগজ শিল্প ঃ পশ্চিমবঙ্গের টিটাগড়, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমহিন্দ্রী, হরিয়ানার ফিরোজাবাদ, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, মহারাষ্ট্রের মুম্বাই, ওড়িশার ব্রজরাজনগর ও রায়গড়াতে আছে।

অ্যালুমিনিয়াম ঃ ওড়িশার সম্বলপুর, কোরাপুট ও অনুগুল, ছত্রিশগড়ের বিলাসপুর ও পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে আছে।

চিনিকল ঃ ওড়িশার আস্কা, বরগড়, নয়াগড়, ঢেঙ্কানাল ও রায়গড়া এবং উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে চিনিকল আছে।

সিমেন্ট শিল্প ঃ ওড়িশার রাজগাঙ্‌পুর ও বরগড়, গুজরাটের পোরবন্দর, হরিয়ানার সুরাইপুর, মধ্যপ্রদেশের কটনী ও অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুর প্রভৃতি স্থানে আছে।

সার কারখানা ঃ ওড়িশার পারাদ্বীপ, রাউরকেল্লা, বিহারের সিন্ধ্রি, আসামের কামরূপ, মহারাষ্ট্রের ট্রাম্পে, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর ও পাঞ্জাবের নঙ্গলে আছে।

রহিম ঃ তুমি ত আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও শিল্প বিষয়ে অনেক কথা বললে। মামাবাড়ি আর কত দূর?

বাবা ঃ এই ত মামার নতুন বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। চল যাই। তোর ওখানে খুব ভাল লাগবে।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- জঙ্গল সম্পদ, জল সম্পদ, মৃত্তিকা সম্পদ, পশু সম্পদ, খনিজ সম্পদ, মানব সম্পদ আমাদের দেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ।
- ধান, কার্পাস, পাট, চা, চিনাবাদাম, ইক্ষু ইত্যাদি আমাদের দেশের কয়েকটি প্রধান ফসল।
- কোন দেশের সংরক্ষিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যথোপযুক্ত ভাবে বিনিয়োগ করতে পারলে সে দেশের উন্নতি সম্ভব।

অভ্যাস

১. ভারতের কোথায় দেখা যায়? খালি স্থানে উত্তরটি লেখো।

ক) বেশি সংখ্যায় উন্নত শ্রেণীর গাভী ও মহিষ

খ) লোনামাটির অঞ্চল

গ) এটেঁল মাটি

ঘ) উর্বর মৃত্তিকা

ঙ) পৃথিবী প্রসিদ্ধ চন্দন কাঠ

২. নীচে কয়েকটি খনির নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে সেই খনি আছে তেমনি যে কোন দুটি স্থানের নাম খালি বাক্সে লেখো।

সোনার খনি

ম্যাঙ্গানিজ খনি

তামা খনি

অভ্র খনি

৩. কৃষি ভিত্তিক

কার্পাস
পাট
রেশম ও অন্যান্য বস্ত্র
কাজু
চিনি
তামাক
বনস্পতি
কাগজ
কাঠ
রবার
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
লাক্ষাদ্বীপ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

মানচিত্রটি ভালোভাবে দেখো। ✓এই চিহ্ন দিয়ে তলার সারণী পূরণ কর।

রাজ্যের নাম অঞ্চলের নাম	ধান	গম	ইক্ষু	কার্পাস	পাট	চা	চিনাবাদাম	সরষে	নারকেল
মহারাষ্ট্র			✓						✓
দক্ষিণস্থ মালভূমি অঞ্চল									

৪. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র রিঙ্কু ও রমেশ নিম্ন তালিকাভুক্ত কৃষি কাজগুলি ভালো হওয়ায় ২টি রাজ্য দেখতে যাওয়ার জন্য স্থির করল। ওরা কোন চাষ দেখার জন্য কোন কোন রাজ্য যাবে তা খালি স্থানে লেখো।

কার্পাস		
চিনাবাদাম		
চা		
পাট		
ধান		
গম		
নারকেল		

৫. শূণ্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) ছত্তীশগড়ের .... কাছে লৌহ ইস্পাত কারখানা আছে।

খ) আমাদের ওড়িশার .... ও .... কাছে চিনিকল আছে।

গ) ওড়িশার .... ও .... কাছে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে।

৬. তাঁত শিল্প থাকা রাজ্য ও স্থানের নাম খালি স্থানে পূরণ করো।

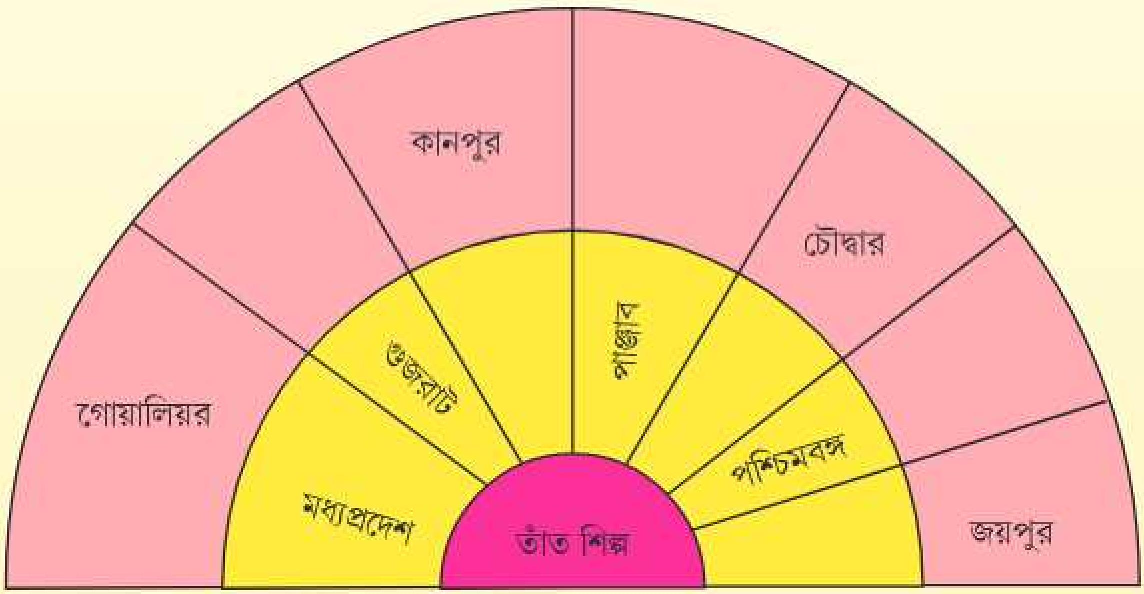

৭. সার কারখানা অবস্থিত রাজ্য ও অঞ্চলের নাম ফুলের পাপড়িতে লেখো।

৮. 'ক' স্তম্ভের প্রত্যেক রাজ্যের নামের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভে থাকা সম্পৃক্ত রাজ্যের অঞ্চলের সঙ্গে মিলিয়ে লেখো।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
গুজরাট	সুরাইপুর
অন্ধ্রপ্রদেশ	কটনী
হরিয়ানা	পোরবন্দর
মধ্যপ্রদেশ	গুন্টুর
	বরগড়

৯. ভুল থাকলে ঠিক করে লেখো।

ক) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় কাগজ কল আছে।

খ) ছত্তীশগড়ের বিলাসপুর জেলায় এ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে।

গ) পশ্চিমবঙ্গের নবরংপুর অঞ্চলে এ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে।

ঘ) অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দ্রাবাদে কাগজ কল আছে।

ঙ) উত্তর প্রদেশের লক্ষ্মৌ -এ কাগজ কল আছে।

১০. সব শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে কি অসুবিধা হবে লেখো।

বাড়িতে বসে করঃ

তোমার অঞ্চলে আগে চাষ করা হোত কিন্তু এখন হয় না, সেই চাষ না করা ফসলগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। যদি সে রকম কিছু ফসল থাকে তবে সে গুলি চাষ না করার কারণ কি? বাড়ি থেকে লিখে এনে শ্রেণীকক্ষে তা' উপস্থাপন করো।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান

■ তোমার দেখা অথবা পরিচিত যে কোন পাঁচটি দর্শনীয় স্থানের নাম লেখো। সেগুলি প্রসিদ্ধির কারণ উল্লেখ কর।

দর্শনীয় স্থানের নাম	স্থানটি কেন প্রসিদ্ধ

দিল্লী ঃ

দিল্লী আমাদের দেশের রাজধানী। রাষ্ট্রপতি ভবন, সংসদ ভবন (Parliament), সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (Supreme Court) , সচিবালয়, ইন্ডিয়াগেট, লালকেল্লা, কুতুবমিনার, অক্ষয়ধাম, বাহাইমন্দির, জামামসজিদ, বিড়লামন্দির, বিভিন্ন সংগ্রহশালা, রাজঘাট, শক্তিস্থল, শান্তিবন, বিজয়ঘাট ইত্যাদি অনেক দর্শনীয় স্থান এখানে আছে।

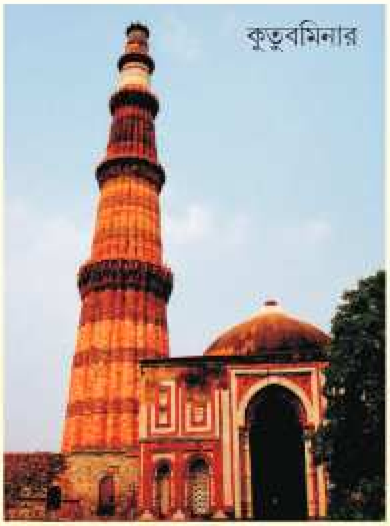
কুতুবমিনার

সংসদ ভবন

সুপ্রিম কোর্ট

রাষ্ট্রপতি ভবন

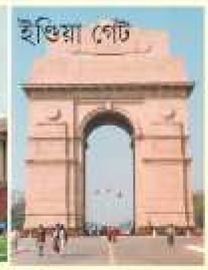
ইন্ডিয়া গেট

মুম্বাইঃ

ভারতের অন্যতম প্রধান নগরী। মুম্বাই আরব সাগর কূলে অবস্থিত। এই শহরে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দির, বুট হাউস, মহালক্ষ্মী মন্দির, এলিফ্যান্টা দ্বীপ, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী, গেট ওয়ে অফ্ ইন্ডিয়া (ভারতের প্রবেশ দ্বার) ইত্যাদি প্রধান দর্শনীয় স্থান।

গেট ওয়ে অফ্ ইন্ডিয়া

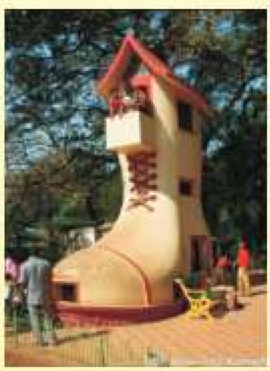
বুট্ হাউস

জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী

কলকাতা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার হাওড়া ব্রিজ এক ঝুলন্ত ব্রিজ রূপে প্রসিদ্ধ। এই সেতুর নির্মাণ শৈলি দর্শকদের আকৃষ্ট করে। কলকাতার দর্শনীয় স্থান হিসাবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, যাদুঘর, বিরলা প্ল্যানেটোরিয়াম, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, বেলুড় মঠ, ইডেন গার্ডেন স্টেডিয়াম, মেট্রো রেলওয়ে (ভূতল রেলপথ) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

মেট্রো ট্রেন

হাওড়া ব্রিজ

ইডেন গার্ডেন

চেন্নাই ঃ

তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাই বঙ্গোপসাগর তীরে অবস্থিত। এখানকার সমুদ্রতীরের দৃশ্য অতি রমণীয়। এখানের স্নেক পার্কে বিভিন্ন ধরণের সাপ দেখতে পাওয়া যায়।

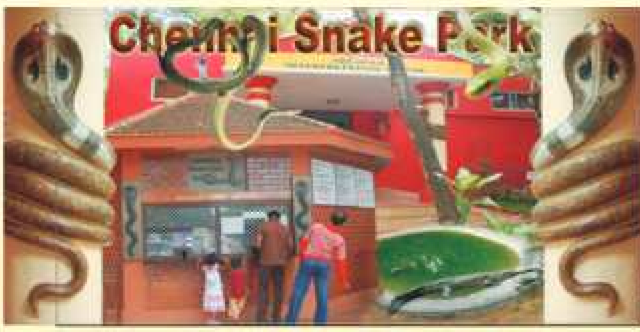

অমৃতসর ঃ

পাঞ্জাবের অমৃতসরে রয়েছে বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির (গোলডেন টেম্পল), এছাড়া রয়েছে ওয়াঘা বর্ডারের মত দর্শণীয় স্থান।

স্বর্ণ মন্দির

আগ্রা ঃ

উত্তর প্রদেশের আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল অবস্থিত।

তাজমহল

জয়পুর ঃ

রাজস্থানের জয়পুরে হাওয়ামহল এক দর্শনীয় স্থান।

হাওয়া মহল

পুরী ঃ

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পুরীর বেলাভূমি ও জগন্নাথ মন্দির দর্শনীয়।

শ্রী জগন্নাথ মন্দির

কোণার্ক ঃ

পুরী থেকে সমুদ্র উপকূল দিয়ে গেলে প্রায় একত্রিশ কিলোমিটার দূরে, বিশ্ব প্রসিদ্ধ কোণার্ক মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটি চলন্ত রথের মত। একে সূর্য মন্দিরও বলা হয়। কোণার্ক মন্দিরের কারুকার্য পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

কোণার্ক মন্দির

দ্বারকা ঃ

গুজরাটের পশ্চিম উপকূলে দ্বারকা নগরীর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির এক পবিত্র তীর্থস্থান। মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তী অপরূপ শোভায় শোভিত।

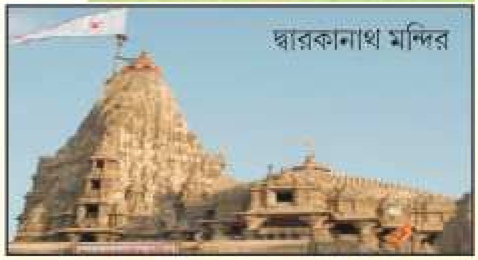
দ্বারকানাথ মন্দির

রামেশ্বরম্ ঃ

তামিলনাড়ুতে বঙ্গোপসাগরের কূলে রামেশ্বরম অবস্থিত। এখানে রামনাথ স্বামী মন্দির দর্শনীয়।

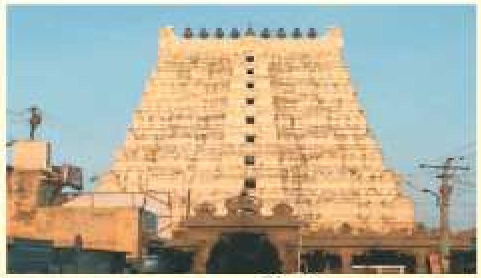
রামনাথ স্বামী মন্দির

হরিদ্বার ঃ

গঙ্গা নদী কূলে হরিদ্বার অবস্থিত। এটি এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে অনেক মন্দির আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

হরিদ্বার

কন্যাকুমারী ঃ

ভারতের পূর্ব-পশ্চিম উপকূলের সংযোগস্থলে কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Camorin) অবস্থিত। এখানে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর একত্র মিলিত হয়েছে। কুমারিকা অন্তরীপের এক স্থলভাগ, সমুদ্রকূলে মিশে গেছে। এই স্থলভাগে কন্যাকুমারী শহর অবস্থিত। এখানে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, বিবেকানন্দ স্মারকী, মহাত্মা গান্ধীর স্মারকী, কন্যাকুমারী মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আছে।

বিবেকানন্দ স্মারকী

তিরুপতি ঃ

তিরুপতি অন্ধ্রপ্রদেশে অবস্থিত। তিরুপতির মন্দিরে প্রভু শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হন। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক ও পর্যটক এখানে সমাগত হন।

শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির

মহীশূর ঃ

কর্ণাটকের অন্তর্গত মহীশূরে রাজপ্রাসাদ, চামুন্ডেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। এখান থেকে কিছু দূরে বৃন্দাবন গার্ডেন এক মনোরম স্থান।

এছাড়া ভারতে আরো অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। তাদের মধ্যে মাউন্ট আবু, সারনাথ, সোমনাথ মন্দির, মীনাক্ষী মন্দির, মহাবলীপুরম্, বদ্রিনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, বুদ্ধগয়া, মনালি, জৈনমন্দির, জ্বালামুখি, বৈষ্ণোদেবী মন্দির প্রভৃতি অসংখ্য মন্দির রয়েছে।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- আমাদেরে দেশে অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। সেই দর্শনীয় স্থান হল ঃ দিল্লী, মুম্বাই, কলকাতা, চেন্নাই, অমৃতসর, আগ্রা, জয়পুর, পুরী, কোণার্ক, রামেশ্বরম্, হরিদ্বার, দ্বারকা, কন্যাকুমারী ও তিরুপতি।

অভ্যাস

১. বন্ধনীর ভিতর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে শূন্যস্থানে বসাও।

ক) ইন্ডিয়াগেট .... শহরে অবস্থিত।
(দিল্লী, চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা)

খ) মুম্বাই শহর .... তীরে অবস্থিত।
(বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগার, আরবসাগর)

গ) স্বর্ণ মন্দির .... শহরে অবস্থিত।
(অমৃতসর, জয়পুর, আগ্রা, দিল্লী)

ঘ) তিরুপতি .... প্রদেশে অবস্থিত।
(অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ)

২. 'ক' স্তম্ভে কয়েকটি দর্শনীয় স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে। 'খ' স্তম্ভে সেই সব দর্শনীয় স্থান অবস্থিত শহরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যে দর্শনীয় স্থান যে শহরে অবস্থিত, সেই দর্শনীয় স্থান ও সেই শহরকে একটি দাগ টেনে জুড়ে দাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
রাষ্ট্রপতি ভবন	কলকাতা
গেট ওয়ে অফ্ ইন্ডিয়া (ভারতের প্রবেশ দ্বার)	চেন্নাই
হাওড়া সেতু	মুম্বাই
স্নেক্ পার্ক	জয়পুর
হাওয়া মহল	দিল্লী
	আগ্রা

৩. রেখাঙ্কিত শব্দগুলি বদল না করে বাক্যটি সংশোধন করে লেখো।

ক) <u>বিরলা মন্দির</u> চেন্নাই শহরে অবস্থিত।

খ) <u>পাঞ্জাবের অমৃতসরে</u> তিরুপতি মন্দির অবস্থিত।

গ) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল হরিদ্বারে দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) রামেশ্বরম্ মন্দির সূর্য মন্দির নামে সুপরিচিত।

ঙ) গুজরাটের পূর্ব উপকূলে দ্বারকা নগরী অবস্থিত।

৪. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে দাও।

ক) আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় কোথায় অবস্থিত?

____

খ) ভারতের প্রবেশ দুয়ার কোথায় অবস্থিত?

____

গ) বুট হাউস কোথায় আছে?

____

ঘ) তাজমহল কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

____

ঙ) ভারতের সংসদভবন কোথায় অবস্থিত?

____

৫. তুমি কেন দর্শনীয় স্থান দেখতে যাও, তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

১. _______________

২. _______________

৩. _______________

৪. _______________

৫. _______________

বাড়িতে বসে কর ঃ
তোমার অঞ্চলে কোনও দর্শনীয় স্থানে গিয়ে সেখানে কি দেখলে ৫টি বাক্যে লেখো।

অষ্টম অধ্যায়

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা

ভারত এক বিশাল দেশ। এর সব অঞ্চলের মৃত্তিকা, পরিবেশ, জলবায়ু সমান নয়। এগুলি লোকের জীবনযাত্রার প্রণালীকে প্রভাবিত করে। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রণালী এক প্রকার না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়। জীবনযাপন প্রণালী বললে লোকেদের জীবিকা, পোযাক, খাদ্য, চালচলন, পালপার্বণ ইত্যাদি বোঝায়। এস, আমরা ভারতের কিছু অঞ্চলের জীবনযাপন প্রণালী বা জীবনধারা বিষয়ে জানবো।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা ঃ

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল পাহাড়, পর্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ। চাষের জমি অনেক কম। এই অঞ্চলের পশ্চিম দিকে খুব কম বৃষ্টি হয়। কিন্তু লোক ভেড়া পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভেড়ার লোম থেকে সূতা বের করে গালিচা, পশমের কাপড় বোনে। এ অঞ্চলের লোকেরা পশম কাপড়ের পোষাক ব্যবহার করে। কাশ্মীর রাজ্যের লোকেরা কাশ্মিরী ভাষায় কথা বলে। এদের প্রধান খাদ্য রুটি। এ রাজ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ। এ রাজ্যে সারা বছর পর্যটকদের সমাগম হয়। সুতরাং পর্যটকদের দেখাশোনা করা, সুযোগ-সুবিধা যুগিয়ে দেওয়া তাদের এক প্রকার জীবিকা। এদের ফুল ও ফলের চাষও জীবিকা অর্জনের একটি মাধ্যম।

কাশ্মীর সন্নিকটস্থ হিমাচল প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা লম্বা পোযাক পরে। ওড়না ব্যবহার করে। পুরুষেরা লম্বা পোযাকের সঙ্গে টুপি পরে। দশহরা এখানের প্রধান পর্ব। এছাড়া দোল ও ইদ উৎসব বেশ সমারোহের সঙ্গে এরা পালন করে। এদের মুখ্য ভাষা হিন্দী। উত্তরাঞ্চল রাজ্যে অনেক তীর্থস্থান থাকায় পর্যটক ও তীর্থযাত্রী বহু সংখ্যায় প্রায় সারা বছরই আসে। কাজেই ব্যবসা করে তারা সংসার চালায়। হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের পূর্বদিকে নানা জাতের আদিবাসী

বাস করে। তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। আসামের লোকে অসমীয়া ভাষা, মণিপুর রাজ্যের লোকে মণিপুরী, মিজোরামের লোকে মিজো, মেঘালয় রাজ্যের লোকে গারো ও খাসি ভাষায় কথা বলে। ত্রিপুরার প্রধান ভাষা বাংলা। এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ লোক বাঁশের তৈরি ঘরে বাস করে। গৃহের ছাত ঢালু ধরণের। নাগারা বাঁশ ও বেতের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে অনেক লোক বাস করে। ভাত এদের প্রধান খাদ্য।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা নাচ গান ভালোবাসে। মনীপুরী নৃত্য, আসামের বিহু নৃত্য, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের বাঁশের নাচ দেশের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আসামের মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে বিহু পর্ব পালন করে। নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে খ্রীষ্টমাস পর্ব পালিত হয়।

পশ্চিমস্থ মরুভূমি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা ঃ

রাজস্থানের অধিকাংশ অঞ্চল মরুভূমি। মরু অঞ্চলে লোকেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। এরা ছাগল, ভেড়া পালন করে। বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করে পশুদের চরায়। এদের যাযাবর বলা হয়। এরা উট পালন করে। উটের পিঠে বসে আসা-যাওয়া করে। এরা উটের দুধ ও মাংস খায়। মরুভূমির স্থানে স্থানে থাকা মরুদ্যান অঞ্চলে লোকেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করে। খেজুর, বাজরা, জনার প্রভৃতি চাষ করে। ঘরের ছাদ পার্বত্য অঞ্চলের মত ঢালু নয়, সমতল। রাজস্থানের অন্য অঞ্চলের লোকেরা স্থায়ীভাবে মাটির ঘরে থাকে। পুরুষেরা লম্বা পাগড়ি বেঁধে ধুতি ও ফতুয়া পরে। মেয়েরা ঝলমলে পোষাক পরে। এ অঞ্চলের লোকেদের প্রধান খাদ্য রুটি। অধিকাংশ লোক নিরামিষাশী। এদের ভাষা হিন্দী। এরা সাধারণতঃ খনি খাদানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। দশহরা, দীপাবলী, হোলি ও ইদ পর্ব পালন করে।

আমরা কি শিখলাম ঃ

মৃত্তিকা, জলবায়ু অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। এজন্য অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হয়।

অভ্যাস

১. **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) কাশ্মীরের পুরুষেরা .... পোষাক পরে।

খ) কাশ্মীরের লোকেরা .... পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ) আসামের লোকে .... পর্ব পালন করে।

ঘ) বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন জিনিস ....রা তৈরি করে।

ঙ) উটের মাংস, দুধ .... অঞ্চলের কিছু লোক খায়।

২. **উত্তর দাও ঃ**

ক) মরুভূমি অঞ্চলের কিছু লোক যাযাবর জীবনযাপন করে কেন ?

খ) মরুভূমি অঞ্চলের লোকেরা কেন ঢিলা পোষাক পরে ?

গ) পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা ঢালু ছাদের বাড়ি তৈরি করে কেন ?

ঘ) কাশ্মীরে কেন বেশি পর্যটক আসে ?

৩. ‘ক’ স্তম্ভে থাকা অধিবাসীদের ‘খ’ স্তম্ভের ভাষার সঙ্গে যুক্ত কর।

“ক” স্তম্ভ	“খ” স্তম্ভ
ত্রিপুরা	মণিপুরী
হিমাচল	গারো
মণিপুর	বাংলা
মেঘালয়	মিজো
মিজোরাম	অসমীয়া

নবম অধ্যায়

আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানি

আমাদের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে কিছু আমাদের অঞ্চলে পাওয়া যায় আর কিছু দ্রব্য বাইরে থেকে আনতে হয়। অন্য রাজ্য তথা অন্য জায়গা থেকে আমাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য আনাকে আমদানী বলা হয়। আমাদের দেশে চাহিদা মত খনিজ তেল পাওয়া যায় না। তাই অন্য দেশ থেকে আমাদের খনিজ তৈল আমদানী করতে হয়। এছাড়া আমাদের দেশ অন্য থেকে যন্ত্রপাতি, সার, স্টিল, কাগজ, খাবার তেল, দস্তা, গম ইত্যাদি আমদানী করে।

জাহাজে লোহা পাথর তোলা হচ্ছে

জাহাজ থেকে মাল নামানো হচ্ছে

কোনও দেশ তার চাহিদা থেকে অতিরিক্ত উৎপাদিত খাদ্য শস্য ও অন্যান্য সামগ্রী অন্য দেশের আবশ্যক মত সেখানে পাঠায়। একে রপ্তানি বলা হয়। আমাদের দেশ থেকে প্রধানতঃ রপ্তানী করা হয় চিনি, পাট, চাল, চা, সুতীবস্ত্র, লোহা, লোহার পাত, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ, পাথর, অভ্র, ফেরোক্রম, চিংড়ি, মাছ ইত্যাদি দ্রব্য সমূহ।

আমদানী ও রপ্তানির দ্বারা দেশের সঙ্গে দেশের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সোভিয়েট দেশ, বিলাত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের বেশি আমদানী রপ্তানি কারবার হয়।

তোমার অঞ্চলেও কিছু জিনিস বাইরে পাঠানো হয় আবার কিছু জিনিস বাইরে থেকে তোমার অঞ্চলে আনা হয়। তাদের তালিকা প্রস্তুত কর।

তোমার অঞ্চল থেকে রপ্তানি হওয়া দ্রব্য	তোমার অঞ্চলে আমদানী হওয়া দ্রব্য

আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানি স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে হয়। এবার মানচিত্র দেখে কোন কোন দেশের সঙ্গে স্থলপথে আমদানী/রপ্তানি কারবার হতে পারে বল।

জাতীয় রাজপথ

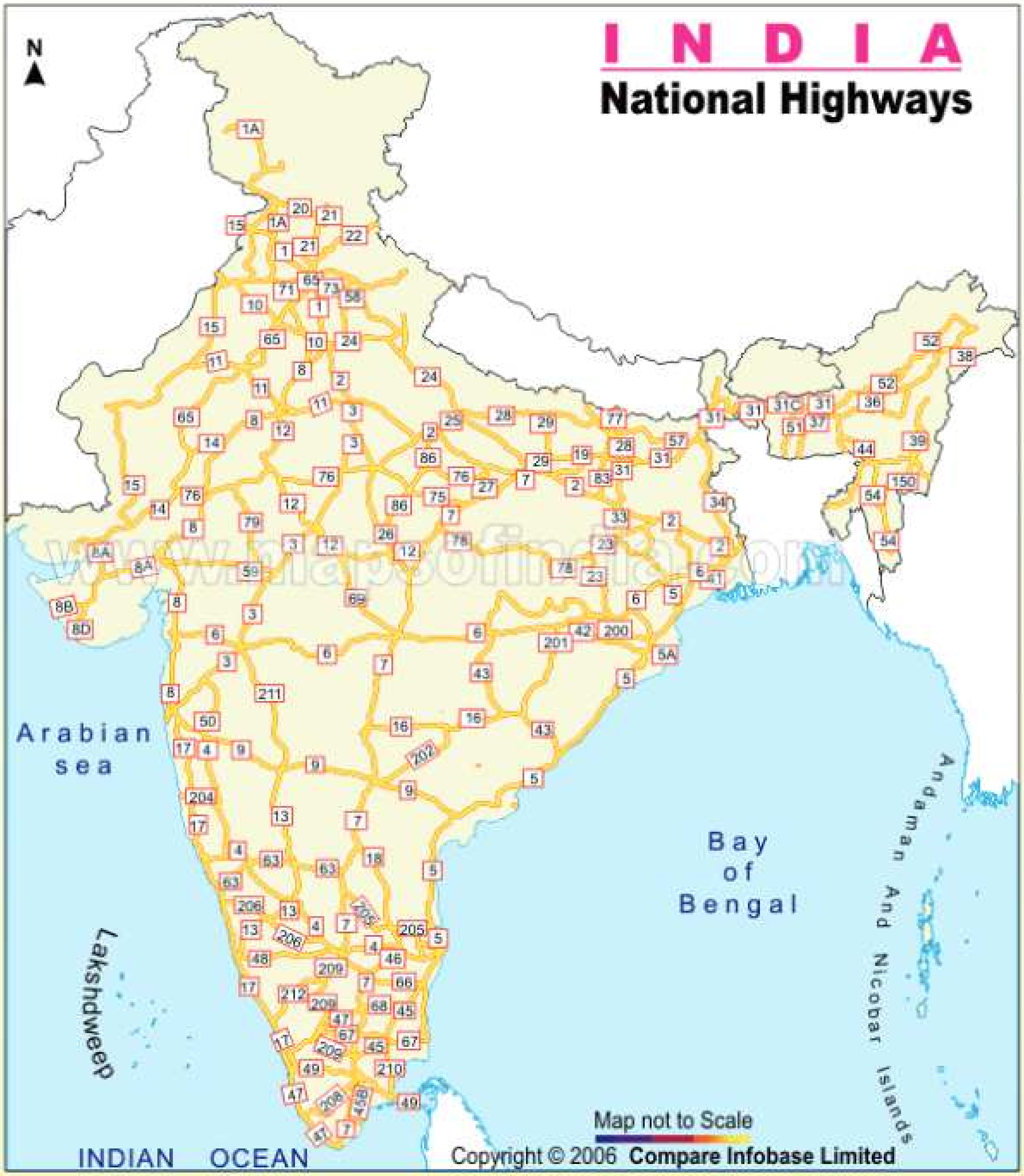

এই মানচিত্র থেকে আমরা জানতে পারি ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী দেশ পাকিস্থান, বাংলাদেশ, নেপাল, চীন, ভুটান প্রভৃতি দেশের সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু স্থলপথে দূরদূরান্ত দেশগুলির সঙ্গে গমনাগমনের সুবিধা সুযোগ নাই। সেজন্য জলপথ ও আকাশপথ ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশের প্রধান বন্দরগুলি যথা - কলকাতা, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম্, চেন্নাই, কান্ডলা, কোচিন, মুম্বাই ইত্যাদি জলপথ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করি ও দ্রব্য সামগ্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করি। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাণিজ্য কারবার (আমদানী ও রপ্তানি) করি।

(প্রদত্ত মানচিত্রে বন্দর ও জলপথগুলি দেখ)

আকাশপথ হচ্ছে যোগাযোগ ও গমনাগমনের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম। উড়োজাহাজে আমরা পৃথিবীর যে কোনও স্থানে অল্প সময়ে যেতে পারি। অন্যপক্ষে উড়োজাহাজ মাধ্যমেও কিছু জিনিস (হাল্‌কা ও ছোট) আমদানী ও রপ্তানি করা যায়। যথা - ক্যাসেট, সফট্ওয়্যার, হীরা ইত্যাদি। আমাদের দেশের ৪টি আর্ন্তজাতিক বিমানঘাঁটি হল কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই। সেই সব বিমানঘাঁটি থেকে প্রতিদিন উড়োজাহাজ ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, আমেরিকা, জার্মানী, চীন, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, আরব ইত্যাদি দেশ যাওয়া

আসা করে। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশের ভিতরে আকাশপথে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে বিমানঘাঁটি আছে। মানচিত্র থেকে আকাশপথ গুলি দেখে তাদের নাম লেখো।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- প্রয়োজন মত সমস্ত দ্রব্য নিজের দেশে পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই জিনিসগুলির চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য দেশ থেকে আনতে হয়। একে আমদানী বলা হয়।
- আমাদের দেশের প্রধান আমদানী দ্রব্যগুলি হল খনিজ তৈল, সার, তামা, দস্তা, যন্ত্রাংশ, টিন, কাগজ।
- আমাদের দেশের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদিত দ্রব্যগুলি অন্য দেশে পাঠানো হয়। একে রপ্তানি বলা হয়।
- আমাদের দেশ থেকে যে সব দ্রব্য রপ্তানি করা হয় সেগুলি হল চিনি, পাট, চাল , চা, সূতিবস্ত্র, লোহা, লোহার পাত, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানিজ পাথর, অভ্র,ফেরোক্রোম, মাছ, চিংড়ি ইত্যাদি।
- আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানি প্রধানতঃ স্থলপথ, জলপথ ও আকাশপথে হয়।
- জলপথে ভারি জিনিসগুলি পাঠানো হয় এবং হালকা জিনিসগুলি আকাশপথে পাঠানো হয়।

অভ্যাস

১. খালিস্থানে আমাদের দেশের আমদানী ও রপ্তানি করা জিনিসগুলির নাম লেখো।

আমদানী দ্রব্য	রপ্তানি দ্রব্য

২. পার্থক্য লেখো।
আমদানী ও রপ্তানি

৩. আমাদের আমদানী ও রপ্তানি প্রধানতঃ জলপথে হয় কেন?

৪. ক) আমাদের দেশের প্রধান বন্দরগুলির নাম লেখো।

খ) আমাদের দেশের প্রধান বিমানঘাঁটি গুলির নাম লেখো।

৫. ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির নাম লেখো। ঐ দেশগুলির মধ্যে কাদের সঙ্গে আমাদের সড়কপথে বাণিজ্য কারবার হয়?

দশম অধ্যায়

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন

কিছু ইংরেজ বণিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া নামক এক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করল। আমাদের দেশে এসে বাণিজ্য ব্যবসা করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তারা মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি নিয়ে প্রথমে সুরটে তাদের ব্যবসা আরম্ভ করল। কালক্রমে বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই),কলিকাতায় (অধুনা কলকাতা) বাণিজ্য কুঠিবাড়ি স্থাপন করল।

নীচে ভারতের রেখাঙ্কিত মানচিত্র দেওয়া হয়েছে। সেই মানচিত্রে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি কোথায় ছিল, তা দেখাও। সেই সব স্থানের সংলগ্ন জলভাগের নাম উল্লেখ কর।

বাণিজ্য ব্যবসা করে ইংরেজরা ভারত থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করল। আমাদের দেশের সেই ধন সম্পদ লুট করে কিভাবে তাদের দেশে নিয়ে যাবে তারা চিন্তা করল। তারা দেখল, আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে একতা নাই। তাদের যারা শাসন করে সেই রাজা রাজড়াদের মধ্যে সব সময় দ্বন্দ্ব বিরোধ লেগে থাকত। কেউ কেউ আবার তাদের সাহায্যের জন্য অনুরোধ করল। ইংরেজরা এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না। কূটনীতি ও স্বার্থের আশ্রয় নিয়ে তারা দেশীয় রাজাদের দুর্বল করল ও যুদ্ধে পরাজিত করল। পরে পরে তাদের শাসন ব্যবস্থায় উৎপাত অত্যাচার আরম্ভ করল ও তাদের বিতাড়িত করে রাজ্য শাসন করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে দমন পীড়ন নীতি অনুসরণ করে অন্য রাজ্যগুলিও দখল করে নিজেদের স্বার্থ-সাধন চরিতার্থতার জন্য সমগ্র ভারত শাসন করতে লাগল। ফলে আমরা পরাধীন হলাম, স্বাধীনতা হারালাম।

আমাদের দেশের লোকেরা সরল ও বিশ্বাসী ছিল। তারা প্রথমে ভেবেছিল যে, ইংরেজরা আমাদের দেশে কিছু দিনের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু তা হল না। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের দমন-শাসন-অত্যাচারের রূপ বেরিয়ে পড়ল। বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক ভাবে এদেশের লোকেদের কাজ করতে হল। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিনা কারণে সংঘর্ষ শত্রুতার আবহ তৈরি করল। দেশীয় লোকদের নির্মিত জিনিসপত্রের উপরে মাত্রাতিরিক্ত কর বসাল। কৃষকদের উপরে অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দিল। অন্যায়ভাবে রাজা রাজড়াদের গদিচ্যুত করল। ওদের রাজ্যও ইংরেজরা তাদের শাসনাধীনে রাখল।

ইংরেজদের কূট অভিসন্ধি ক্রমশঃ আমাদের দেশের লোকেরা বুঝতে পারল। তাদের অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় চিন্তা করল। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত সিপাহীরাও ইংরেজদের ভেদ-বিভাজনের নীতি বুঝতে পেরে তা' প্রত্যাখ্যান করল। ১৮৫৭ সালে বাংলার ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হল। এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী ও নানাসাহেব। ওড়িশার চাখি খুন্টিয়া (চন্দন হজুরি) যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

সম্বলপুরের বীর সুরেন্দ্র সাএ ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তিনি তার ভাই ও অনুগতদের নিয়ে সম্বলপুরে ইংরেজদের সঙ্গে তুমুল লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এর ফলে ইংরেজদের প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয় ও তাদের মনোবলও ভেঙে পড়ে। ব্রিটিশ শাসনের অকথ্য অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ১৮৫৭ সালে 'সিপাহী বিদ্রোহ' দেখা দিল। ইহাই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

সুরেন্দ্র সাএ

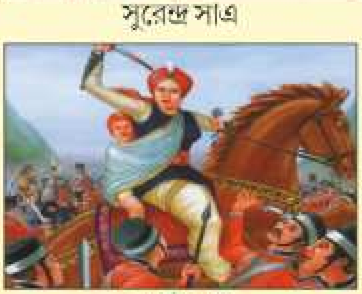
লক্ষ্মীবাঈ

তাঁতিয়াটোপি

১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহকে ঐতিহাসিকরা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন কেন ? তার যে কোনও তিনটি কারণ উল্লেখ কর।

১. ________________

২. ________________

৩. ________________

সিপাহী বিদ্রোহের পরে উত্তেজিত ইংরেজরা আরও বেশি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে এদেশীয় লোকদের উপরে নির্মম অত্যাচার করল। এর মাধ্যমে তাদের ঔদ্ধত্যের আড়াল আর রইল না। এই সময় ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের এক শান্তিপূর্ণ সভা হয়। সেই সভায় নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সকলেই উপস্থিত ছিল। অফিসার জেনারেল ডায়ার সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন ও কোন প্রকার সংকেত ছাড়াই অতর্কিত ভাবে সমবেত লোকদের উপরে ইংরেজ সৈন্যদের গুলি চালানোর আদেশ দেন। ফলে বহু নিরস্ত্র নিরপরাধ লোক সভাস্থলেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ল। আহত লোকেদের চিকিৎসার পরিবর্তে বেত্রাঘাত ও অপমানিত করা হয়। বাইরের জগত থেকে পাঞ্জাবকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হল, এই নির্মম অত্যাচারের খবর যাতে বাইরে না যায়।

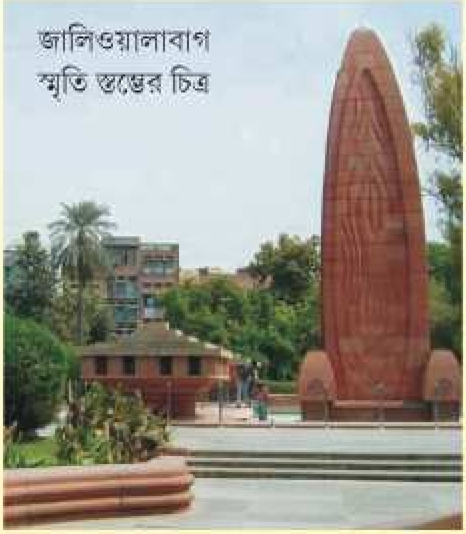

জালিওয়ালাবাগ স্মৃতি স্তম্ভের চিত্র

গান্ধিজীর মত ব্যথিত অনেক নেতা পাঞ্জাব যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হল না। তবুও এই খবর আস্তে আস্তে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভারতবাসীদের মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কারের ভাব জাগ্রত হল।

ওই সময় পাঞ্জাবে এক স্বাধীনচেতা যুবক ছিল। তার নাম উদ্দাম সিং। সে ছলে বলে কৌশলে জেনারেল ডায়ারকে শাস্তি দেবার জন্য শপথ নিল। অবশেষে ইংল্যান্ডে গুলি করে ডায়ারকে হত্যা করল।

ইংরেজ সরকারের দমন পীড়ন নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল। আন্দোলনের নেতৃত্বে রইলেন মহাত্মা গান্ধী। আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত। অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে দেশবাসীকে পরামর্শ দিলেন মহাত্মা গান্ধী। হিংসার পথ অবলম্বন করলে স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বজনগ্রাহ্য না হবার আশঙ্কা করতেন গান্ধীজী।

পণ্ডিত গোপাবন্ধু দাশ

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিলেন সমগ্র ভারতবাসী। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল কলেজ বয়কট করল। তারা নিজের সাধ্যমত অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন জানাল। সরকারী কর্মচারীরা চাকরি থেকে ইস্তফা দিল। উকিলরা ওকালতি ছেড়ে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। স্বাধীনচেতা কিছু ব্যক্তি তাঁদের উচ্চপদের চাকরি, সাম্মানিক পদবী, সম্মানজনক মন্ত্রক ইত্যাদি বর্জন করল। চারিদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব আন্দোলনের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ল। পরিশেষে এই আন্দোলন গণ আন্দোলনে পরিণত হল।

আমাদের রাজ্য ওড়িশায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উৎকলমণি পন্ডিত গোপবন্ধু দাশ। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরাতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংসা নীতিতে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন আন্দোলনকারীরা সেখানের একটি থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। এর ফলে থানার সিপাইরা জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে মারা গেল। এবং কিছু পুলিশ কর্মচারীকে অত্যাচারীরা হত্যা করল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী মনে বড় আঘাত পেলেন। তিনি ভারী অস্থির হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, হিংসার পথে অসহযোগ আন্দোলন এগোলে বিভ্রাট দেখা দেবে। লক্ষ্য যে স্বাধীনতা সংগ্রাম তা ব্যর্থ হবে। তাই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন। এই অবস্থায় ইংরেজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেফতার করল। কিন্তু দু' বছর পরে তিনি মুক্তি পেলেন। তাঁর নেতৃত্বে দেশের অনেক গঠনমূলক কাজ করা হল। লোকেরা চরকায় সূতা কেটে কাপড় বুনল, খদ্দরের কাপড় পরল ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন করল।

আমাদের দেশের লোক যাতে সমুদ্র থেকে নুন তৈরি করতে না পারে সেজন্য আইন তৈরি করল। এই আইন গান্ধীজী ও দেশের লোকদের আত্মসম্মানবোধ আহত হল। সকলেই এই আইনের প্রতিবাদ করল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ গান্ধীজী সত্যাগ্রহীদের নিয়ে গুজরাটের দান্ডী নামক স্থানে লবণ প্রস্তুত করার জন্য গেলেন। এটি ইতিহাসের পাতায় গান্ধীজীর ''দান্ডিযাত্রা'' নামে পরিচিত। ওই বছর ৬ই এপ্রিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে লবণ আইন অমান্য করে

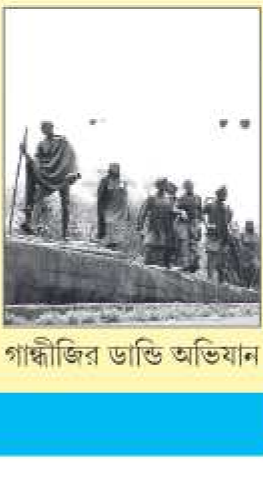

গান্ধীজির ডান্ডি অভিযান

নুন তৈরি করা হল।

আমাদের রাজ্যের সত্যাগ্রহীরাও ইঞ্চুড়ি, অন্তরঙ্গ, গোপ, হুমা, ইরম ইত্যাদি স্থানে সমবেত হয়ে নুন তৈরি করল। এ কাজের নেতৃত্বে ছিলেন নবকৃষ্ণ চৌধুরী, রমাদেবী, মালতী দেবী ও অন্যান্য বহু নেতৃস্থানীয় মানুষ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক যুবক ও নেতৃস্থানীয় লোক যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লক্ষ্মণ নায়ক, রঘু দিবাকর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

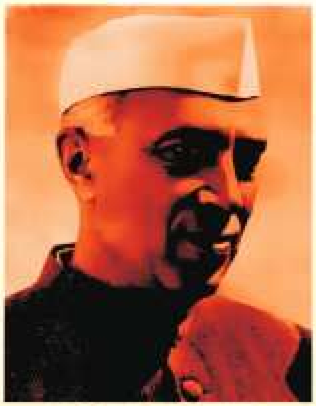

জওহরলাল নেহেরু

গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন উপরে সুভাষ চন্দ্র বসুর আস্থা ছিল না। তাই তিনি ভারত ছেড়ে জাপান চলে গেলেন। সেখানে যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈনিকদের একত্রিত করলেন। তাদের নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করেন, নাম রাখেন "আজাদ হিন্দ ফৌজ"। "দিল্লী চলো" স্লোগান দিয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন। সৈন্যরা তাঁর আহ্বানে ভারতের রাজধানী দিল্লী অধিকার করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হল। দেখতে দেখতে দেশভূমির কিছু অংশ ওদের অধিকারে এল। তিনি সব সময় বলতেন "আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা এনে দেব"।

আজ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে নিজের ত্যাগপুত জীবন, কর্মনিষ্ঠা ও আজাদ হিন্দ ফৌজ -এর প্রতিষ্ঠাতা রূপে সংগ্রামী সুভাষ চন্দ্র বসু স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

সুভাষ চন্দ্র বোস

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের প্রধান নেতারা লক্ষ্য করলেন যে, কেবল বিভিন্ন প্রকারের আইন অমান্য আন্দোলন করলেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হবে না। সেজন্য ইংরেজ সরকারকে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ দাবি জানালেন

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেসের কার্যকারী কমিটির এক বৈঠক হয়। "ভালোয় ভালোয় ইংরেজ সরকার সত্বর ভারত ছেড়ে চলে যাও"। এই কমিটিতে এই প্রকার একটি প্রস্তাব নেওয়া হল এবং অধিকাংশ সভ্যদের দ্বারা এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার এই প্রস্তাবে অসম্মত হলে ভারত ব্যাপী আন্দোলন তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরের দিনই মহাত্মা গান্ধীকে বন্দী করা হল। তাঁর সঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, আচার্য কৃপালিনী, আসফ আল্লী প্রভৃতি

শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের গ্রেফতার করা হল। দেখতে দেখতে দাবানলের মত এই গ্রেফতারের খবর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে দেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইংরেজ শাসক ''ভারত ছাড়ো'' ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল ভারতের আকাশ বাতাস। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সরকারী অফিস, ডাকঘর, রেলস্টেশন ইত্যাদি পুড়িয়ে দিল। ইংরেজ সরকার শোষণ-পীড়ন-আক্রমণ শুরু করল। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গ্রেফতার করা হল। অনেকেই গ্রেফতার হলেন তবু সংগ্রামের পথ থেকে সরে এলেন না। ইংরেজদের উৎখাত ও স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা কৃতমনস্ক।

সরকারের এই দমনমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে গান্ধীজী খবর পেলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি জেলেই অনশনে বসলেন। পরিস্থিতির কথা ভেবে ইংরেজ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে জেল থেকে মুক্তি দিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ইংরেজ সরকার অনুভব করল যে ধমক চমক ও সামরিক শক্তি বলে ভারত শাসন আর সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক দলের নেতা আট্‌লি বিলাতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। তিনি ভারতীয়দের সুনজরে দেখতেন। তাঁদের দাবিও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করতেন। ১৯৪৭ -এ বিলাতের পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন অনুমোদিত হল। এই আইনের বলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত তার বহু আকাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করল। আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক ভাবে জগৎবাসীর কাছে পরিচিত হলাম। আমাদের নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীনতাকাঙ্খী ভারতবাসীর স্বার্থত্যাগের জন্য এটা সম্ভবপর হয়েছিল। অনেক কষ্ট, অনেক মানুষের আত্ম বলিদান পরে আমাদের দেশের শাসনভার আমরা ফিরে পেলাম। আমরা স্বাধীনভাবে নিজে নিজেকে শাসন করতে পারছি। স্বাধীনতা আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। কোনও সময় কোনও পরিস্থিতিতেই এই ত্যাগলব্ধ স্বাধীনতা আমাদের হাতছাড়া করা উচিৎ নয়। অতএব এর সুরক্ষা আমাদের সকলের এক মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- কয়েকজন ইংরেজ বণিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করল। তারা মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করল।
- আমাদের দেশের কিছু শাসক ও লোকের একতা না থাকায় ইংরেজরা ভারতবর্ষের অনেক রাজ্য শোষণযন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের অধীনে রাখতে পারল।

- ক্রমশঃ ইংরেজরা আমাদের দেশের ধন রত্ন তাদের দেশে নিয়ে যেতে শুরু করল ও আমাদের দেশের লোকদের উপরে নির্মম ভাবে পীড়ন-অপমান-অত্যাচার করতে লাগল।
- তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীরা এক বিদ্রোহ করেছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।
- ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের মূল কান্ডারী জেনারেল ডায়ার।
- ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০ -এ লবণ-সত্যাগ্রহ, ১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলন দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল।
- ভারতে চিরকাল শাসন করা অসম্ভব জেনে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী অট্‌লী ভারতীয়দের স্বাধীনতা দেবার নিষ্পত্তি নিয়েছিলেন।
- ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল।
- আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের দেশের জনসাধারণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এক অতুলনীয় অবদান।
- স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ প্রদর্শক মহাত্মা গান্ধীকে আমরা জাতির পিতা রূপে শ্রদ্ধা করি।

অভ্যাস

১. বন্ধনীর ভিতর থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে শূন্যস্থানে পূরণ কর।

ক) কিছু ইংরেজ বণিক .... খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
(১৬০০, ১৬০৫, ১৬২০)

খ) সিপাহী বিদ্রোহ .... খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।
(১৮৩৭, ১৮৫৭, ১৮৮৭)

গ) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড .... খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।
(১৯১৭, ১৯১৮, ১৯১৯)

ঘ) ইংরেজ সরকারের দমনমূলক আইন বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন .... খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল।
(১৯২০, ১৯৩০, ১৯৪০)

ঙ) ভারত ছাড়ো আন্দোলন .... খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস কার্যকারী কমিটিতে অনুমোদিত হয়।
(১৯৪১, ১৯৪২, ১৯৪৩)

২. নীচে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম দেওয়া হয়েছে। তাঁরা কোন স্থানের তা নীচের ফাঁকা জায়গায় লেখো।

স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম	তাঁরা কোন স্থানের তা'র নাম
উদ্দাম সিং	
বীর সুরেন্দ্র সাএ	
সুভাষ চন্দ্র বসু	
উৎকলমণি গোপবন্ধু দাশ	

৩. 'ক' স্তম্ভের ঘটনাবলীর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্ক থাকা সালের সঙ্গে দাড়ি টেনে জুড়ে দাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
সিপাহী বিদ্রোহ	১৯১৯ সাল ১৩ এপ্রিল
জালিয়ানওয়ালাবাগ	১৯৩০ সাল
দাণ্ডিযাত্রা	১৯৪৭ সাল
লবণ সত্যাগ্রহ	১৯৪৪ সাল
	১৮৫৭ সাল

৪. ক) লবণ আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে পাঁচটি লাইন লেখো।

খ) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামের কারণ কী ? পাঁচটি লাইন লেখো।

গ) সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওড়িশার কোন্ কোন্ স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ?

ঘ) ''আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব'' — এ কথা কে বলেছিলেন ?

---

৫) অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখো।

১. ______

২. ______

৩. ______

৪. ______

৫. ______

একাদশ অধ্যায়

আমাদের প্রগতি

প্রদত্ত চিত্রগুলি দেখ, ক্রম অনুসারে অতীত কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ব্যবহৃত পরিবহন ব্যবস্থাগুলির নাম লেখো।

উপরের ছবিতে আমরা দেখলাম, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিবহন ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এসব পরিবর্তন বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে সম্ভব হয়েছে। আস্তে আস্তে লোকসংখ্যা বাড়লো। লোকের চাহিদাও বাড়লো। এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের উপরে বিভিন্ন জিনিসের জন্য নির্ভর করে। আমরা শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য অন্যান্য অঞ্চলের উপরে নির্ভর করি। এ সব প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পায়ে চলা দূরত্বের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কাজেই বিভিন্ন যানবাহন ব্যবহার করা আবশ্যক হলো। রাস্তা চওড়া হলো। ফলে বিভিন্ন যানবাহন চলাচলে অসুবিধা রইল না। রাস্তাগুলিকে বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। সেজন্য আজকাল গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সারা দেশে রাস্তাগুলি জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে।

কী কী কারণে যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এলো, আলোচনা করে লেখো।

এখন আমাদের দেশে প্রত্যেক গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা কার্যকারী হচ্ছে। অধিকাংশ গ্রামে সিমেন্টের কংক্রিট রাস্তা তৈরি হওয়াতে যাতায়াত ও পরিবহন চলাচলের অনেক সুবিধা হয়েছে।

এবার আমরা মানচিত্রে আমাদের রাজ্য ও দেশের রাস্তাগুলি দেখবো। এই রাস্তাগুলির মধ্যে রাজ্য রাজপথ ও জাতীয় রাজপথগুলি প্রধান। প্রত্যেক স্থানের সঙ্গে যে সব পাকা রাস্তাসংযুক্ত, তাদের রাজ্য রাজপথ বলা হয়। দেশের বড় বড় শহরের সঙ্গে সংযুক্ত রাস্তাকে ''জাতীয় রাজপথ'' বলা হয়। জাতীয় রাজপথগুলির মধ্যে ৫ নম্বর, ৬ নম্বর, ৪২ নম্বর, ৪৩ নম্বর জাতীয় রাজপথ আমাদের রাজ্য দিয়ে গিয়েছে।

রাস্তার প্রকার ভেদ

- কাঁচা রাস্তা
  - গ্রামের রাস্তা
- পাকা রাস্তা
  - জাতীয় সড়ক
  - রাজ্য রাজপথ
  - জেলার রাস্তা

তুমি জান কী?

কাঁচা সড়ক

❖ কাঁচা রাস্তা মুখ্যতঃ কোনও অঞ্চলের মাটি ও পাথরে তৈরি হয়। এর নির্মাণে খরচা কম।
এ রাস্তা সব ঋতুর উপযোগী নয়।

পাকা সড়ক

❖ পাকা রাস্তা মুখ্যতঃ বালি, নুড়িপাথর, সিমেন্ট মিশ্রণে তৈরি হয়। এর নির্মাণ ব্যয় বেশি। এটা সব ঋতুর জন্য উপযোগী।

--------- ______ এই সংকেত দু'টি মানচিত্রে যথাক্রমে কাঁচা রাস্তা এবং পাকা রাস্তার নির্দেশ দেয়।

সড়ক পথের বৈশিষ্ট্য

জাতীয় রাজপথ - বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানী, প্রধান শহর ও বন্দরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

রাজ্য রাজপথ - রাজ্যের রাজধানী সহ বিভিন্ন জেলার সদর মহকুমা, প্রধান বন্দর ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

জেলা সড়ক - জেলার সদর মহকুমা, বড় বড় গ্রাম ও প্রধান স্থানগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

গ্রাম সড়ক - বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা ছাড়াও গ্রামের সঙ্গে অন্যান্য বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ করে দেয়। এটা মুখ্যতঃ কাঁচা ধরণের। এখন অবশ্য 'গ্রাম সড়ক যোজনা' মাধ্যমে অধিকাংশ গ্রামে পাকা বা কংক্রিট রাস্তা তৈরি করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

মনে রেখো

রাস্তায় দুই চাকা বিশিষ্ট যান চালানোর সময় হেলমেট ও চারচাকার গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। এটা গাড়ি চালকের জন্য নিরাপদ। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে ইহা চালকের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে। মদ্যপান করে গাড়ি চালানো ট্র্যাফিক নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। এর জন্য অধিক দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে। মদ চালকের দুঃসাহস বাড়ালেও গাড়ি চালানোর দক্ষতা কমিয়ে দেয়।

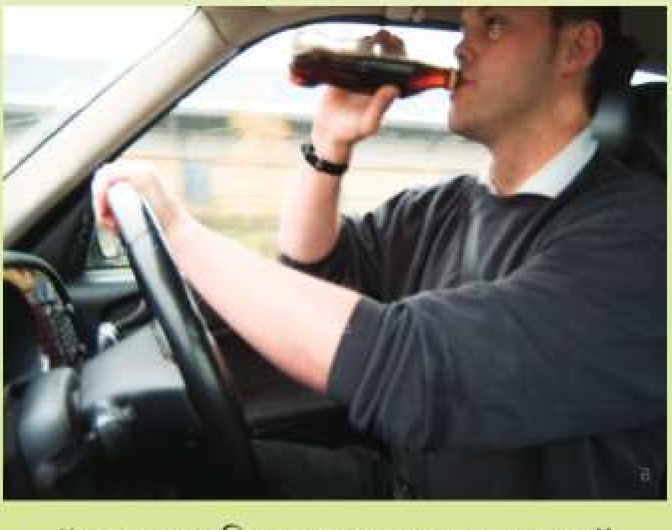

"মদ খেয়ে গাড়ি চালানো মৃত্যুকে আহ্বান করা"

ইহা ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে নিস্তেজ করেই তাছাড়া শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও নিষ্ক্রিয় করে দেয়। ফলে মদ্যাসক্ত চালক গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। মদ্যাসক্ত গাড়ির ড্রাইভারকে ব্রিথালাইজের (Breathalyzer) দ্বারা ধরার পরে মোটর যান নিয়ম অনুযায়ী জরিমানা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল করা হয়। ব্রিথালাইজর এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র যার মাধ্যমে কোনও মানুষ মদ খেয়েছে কিনা তার নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা তৎক্ষণাৎ জানা যায়।

ব্রিথালাইজর

মদ্যপ চালককে ব্রিথালাইজর মাধ্যমে ধরার পরে দণ্ডবিধান করা হচ্ছে।

দু'চাকা বিশিষ্ট গাড়ির চালক ও তার পিছনে বসা ব্যক্তি উভয়ের হেলমেট পরা আবশ্যক নচেৎ মোটরযান অ্যাক্ট ১৭৭ অনুযায়ী ১০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে।

মোটর গাড়ি চালকের সিটবেল্ট পরা আবশ্যক নচেৎ মোটর যান অ্যাক্ট ১৭৭ অনুযায়ী ১০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। এই অপরাধ দ্বিতীয় বার করলে ৩০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

মানচিত্র দেখে রাজ্যের রাজপথের সঙ্গে যুক্ত থাকা শহরের নামগুলি নিম্নস্থ ফাঁকা জায়গায় লেখো।

মানচিত্র দেখে জাতীয় রাজপথ ওড়িশার যে যে শহর দিয়ে গিয়েছে সেই শহরগুলির নাম লেখো।

উপরের মানচিত্র দেখে জাতীয় রাজপথের সঙ্গে যুক্ত থাকা দেশের ৫টি শহরের নাম লেখো।

❖ কাঁচা রাস্তা এবং পাকা রাস্তার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

কাঁচা রাস্তা	পাকা রাস্তা

তোমার গ্রামের নক্সা দেখে ক'টা পাকা রাস্তা এবং ক'টি কাঁচা রাস্তা আছে লেখো।

সড়কপথের মতো রেল পথের অনেক উন্নতি হয়েছে। অপ্রশস্ত রেলপথ প্রশস্ত হয়েছে। পাহাড়িয়া অঞ্চলে যেখানে রেলপথ ছিল না সেখানেও রেলপথ নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। জনবসতিপূর্ণ শহর কলকাতা ও দিল্লীতে পাতাল রেল চলাচল করছে। আমাদের রাজ্যের প্রধান রেলপথ হচ্ছে ''পূর্বতট রেলপথ''।

ওড়িশার মানচিত্রে রেলপথ লক্ষ্য কর। যে যে শহর স্পর্শ করে এই রেলপথ গেছে সেগুলির নাম লেখো।

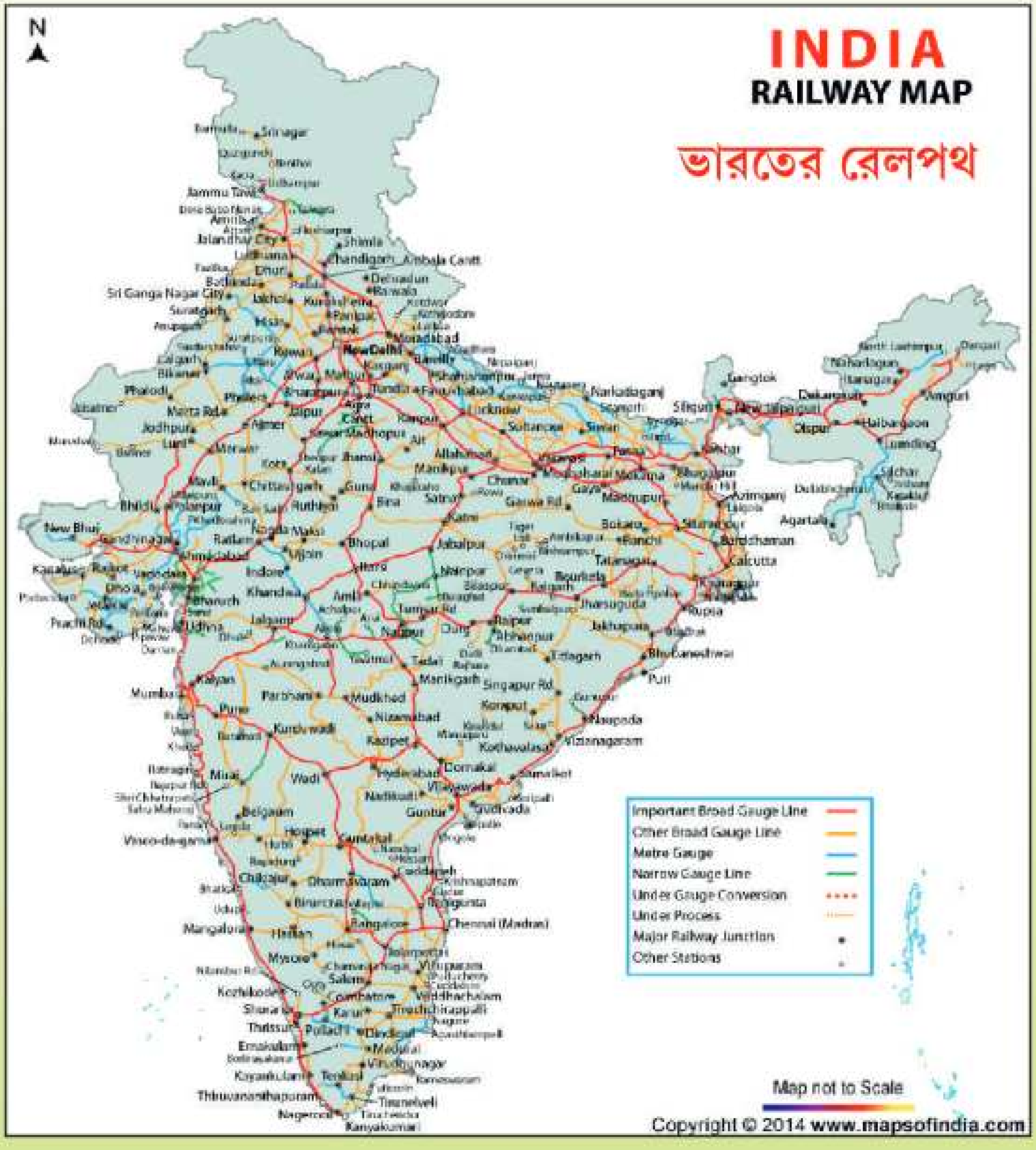

রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত ভারতের ৫টি প্রধান শহরের নাম লেখো।

কেবল যে রেলপথ তা নয়, রেলগাড়িরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে কয়লা ও ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে রেল গাড়ি চলত। কিন্তু এখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিন দিয়ে রেল চালানো হচ্ছে। রেলকামরাগুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা ছাড়াও এগুলিতে খাওয়া, শোওয়া, স্নান ও শৌচালয়ের সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে যাত্রীসাধারণের সুবিধের জন্য। কমপিউটার মাধ্যমে ট্রেন টিকিটের ব্যবস্থা হয়েছে। আজকাল তো ঘরে বসে ইন্টারনেট মাধ্যমেও টিকিট করা যাচ্ছে।

নিজের অঞ্চল থেকে কোন কোন জায়গা আমরা বাসে না গিয়ে ট্রেনে যাওয়ার জন্য বেশি পছন্দ করি ও কেন করি তা লেখো।

দেশের রেলপথের সঙ্গে শহর, বন্দর, খনি ও কারখানা অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে কেন ? নীচে দেওয়া চিত্র দেখে ঠিক উত্তর পর পৃষ্ঠার খালি কুঠরিতে লেখো।

রেলপথের মত আমাদের দেশে জলপথ রয়েছে। দেশের মধ্যে বয়ে যাওয়া বড় বড় নদী ও ক্যানাল দিয়ে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদি যাতায়াত করে। কিন্তু বিদেশের সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে সমুদ্র পথ ব্যবহার করা হয়। মাসের পর মাস ধরে জাহাজগুলি মাল পরিবহনের কাজে সমুদ্র দিয়ে আসা-যাওয়া করে। রেলগাড়ির মত যাত্রীদের সুবিধের জন্য জাহাজেও খাওয়া, শোওয়া, স্নান ও শৌচালয়ের ব্যবস্থা আছে। এজন্য ভারতের উপকূলে বন্দর গড়ে উঠেছে। দিন দিন আমাদের দেশে বন্দরের সংখ্যা বাড়ছে। ওড়িশার গোপালপুর, পারাদ্বীপ, ধামরায় বন্দর আছে। আরও নতুন নতুন বন্দর গড়ে উঠছে।

মানচিত্র দেখে বন্দরগুলির নাম লেখো।

সড়কপথ ও জলপথের মত আকাশপথ আছে। মানুষের বুদ্ধি ও বিকাশের অগ্রগতির জন্য মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব কম সময়ে পৌঁছতে পারছে। আকাশপথেই এটা সম্ভব হয়েছে। উড়োজাহাজে ভুবনেশ্বর থেকে দিল্লী পৌঁছতে মাত্র দু' ঘন্টা সময় লাগে। তেমনি আবার ভারত থেকে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে আকাশপথে খুব কম সময়ে যাওয়া যায়। যে জায়গা সড়কপথ কিংবা রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্ভব হয় নি সেই জায়গা আকাশপথ দ্বারা সংযোগ স্থাপন করা সুবিধাজনক। আমাদের দেশের বড় বড় শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র এই পথ দ্বারা সংযুক্ত। তুমি T.V. তে দেখেছ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে (বন্যা, সামুদ্রিক ঝড়) উড়োজাহাজ ও হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বিপর্যস্ত লোককে সাহায্য করা হয়। চেন্নাই, দিল্লী, মুম্বাই, কোলকাতায় আন্তর্জাতিক বিমানঘাঁটি রয়েছে। এখান থেকে বিদেশে বিমান চলাচল করে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান শহরের সঙ্গেও বিমান চলাচলের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের রাউরকেলা ও জয়পুরে দু'টি ছোট বিমানঘাঁটি আছে। আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হেলিপ্যাড় আছে। হেলিপ্যাড হচ্ছে প্রশস্ত খোলা মাঠ, যেখানে হেলিকপ্টার অবতরণ করে।

আকাশপথে গমনাগমনের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে আমাদের কী কী উপকার হয়েছে লেখো।

কোন কোন জায়গায় আকাশ পথে যাওয়া যায় লেখো।

আজকাল ডাকব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দূরবর্তী স্থানে টাকা, বস্তু ও চিঠি পাঠানো যাচ্ছে। দৈনিক খবর কাগজ, রেডিও, মোবাইল ও দূরদর্শনের মাধ্যমে আমরা খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি। প্রয়োজন হলে জরুরী খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য টেলিফোন ব্যবহার করার সুবিধে পেয়েছি। এখন তো এই ব্যবস্থায় আরও সুবিধে হয়েছে — ই মেল ইন্টারনেটের ব্যবস্থা পেয়েছি। মানুষ ঘরে বসেই পৃথিবীর যে কোনও মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা করতে পারছে ও সে সময় তাকে দেখতেও পারছে। সুতরাং দূরকে নিকট আত্মীয় রূপে সম্পর্ক স্থাপন করার অনেক সহজ ব্যবস্থা আজ আমরা পেয়েছি। মানুষের বুদ্ধি ও তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের বলে যোগাযোগ ক্ষেত্রে এতো দ্রুত প্রগতি সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঃ

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছে। বিভিন্ন মারাত্মক রোগ নির্ণয় করা থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সবকিছুই নতুন নতুন প্রণালীতে করা হচ্ছে। মাইক্রোস্কোপ, এক্স রে, স্টেথিস্কোপ, আলট্রাসোনিক মেশিন, ECG, স্ক্যানিং ইত্যাদি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের ফলে জটিল রোগ নিরূপণ সহজ হয়ে গেছে। ঠিক সময়ে রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্ভব হচ্ছে। আজকাল বিজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার উন্নত ও জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, ইনজেকশন উদ্ভাবন করছে। ফলে রোগীরা মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং মৃত্যুর হার ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। আজকাল ক্যানসারের মত অসাধ্য রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ তৈরি করছেন আমাদের

চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানে অণুশক্তির ব্যবহার হচ্ছে। ছুরি কাঁচির পরিবর্তে অনেক সময় লেজার রশ্মির সাহায্যে অপারেশন করা হচ্ছে।

শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, বয়স্ক লোকের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি, খন্ডিত অঙ্গ সংস্থাপন, চক্ষু, হৃৎপিন্ড ও কিড্‌নি প্রতিস্থাপন, কম্প্যুটর সাহায্যে রোগ নিরূপণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণা ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শক্তি সম্পন্ন যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

এভাবে সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাকে মানুষ প্রয়োগ করে নিজের উন্নতি তথা দেশের প্রগতির পথে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে।

কোনও পরিবার, অঞ্চল, দেশের উন্নতি বিভিন্ন কারণের উপরে নির্ভর করে। এবার তাদের মধ্যে কিছু বিষয়ে এখন আলোচনা করব।

প্রথমে একটি পরিবারের কথা আলোচনা করি। যদি পরিবারের সকলে সকলের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, কঠিন পরিশ্রম করে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি না করে মন দিয়ে কাজ করে, তবে পরিবারটি নিশ্চয় উন্নতি করবে। ঠিক তেমনি কোনও অঞ্চলের প্রগতি সেখানকার লোকদের মধ্যে সহযোগ, কঠিন পরিশ্রম ও শান্ত পরিবেশ উপরে নির্ভর করে। কোনও অঞ্চলে সর্বদা ঝগড়া ঝাটি, মারামারি লেগে থাকলে লোকে ভীত সন্ত্রস্ত অশান্ত হয়ে উঠে। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ জাগ্রত হয়। মন চঞ্চল হয়, কাজে উদাসীনতা দেখা দেয়। এ প্রকার পরিবেশ উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিমন্ডলে প্রগতির পথ ত্বরান্বিত হয়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের প্রগতির প্রতিবন্ধক ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি আশানুরূপ হয় না। এসো দেখি, কেন এমন হয় ? আমাদের দেশের জনসংখ্যা স্বাধীনতা লাভের পরে আজ পর্যন্ত প্রায় ২ গুণ বেড়ে গেছে। রোজগার না করা লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, যারা রোজগার করা মুষ্টিমেয় লোকের উপরে নির্ভর করে। যার ফলে লোকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সব লোক রোজগার করার মত কাজ পায় না। ফলে লোকের আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তৃতীয়তঃ লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়ছে। আবশ্যকীয় জিনিস, সুবিধা, সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ফলে জিনিস পত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। কৃষিজমি, বাসগৃহ, কলকারখানা নির্মাণের জন্য বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কৃষিজমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাচ্ছে। কাজেই ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে তাই দরদাম বেড়ে বেড়ে যাচ্ছে।

সেই কারণে আমাদের টাকার মূল্যও কমে কমে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পারছে না। আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশের উন্নতিমূলক কাজে বাধা আসছে। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সকলকে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাক্ষেত্রে সকলকে উপযুক্ত সুযোগ দিতে বিলম্ব হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই আরও অনুসন্ধিৎসা ও উন্নয়নমূলক কাজের গতি কমে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের জনসংখ্যা কীভাবে বেড়ে যাচ্ছে নীচের সারনি থেকে তা জানা যাবে।

সারনি

সাল	ভারতের লোকসংখ্যা	ওড়িশার লোকসংখ্যা
১৯৫১	৩৬.১৩	১.৪৬
১৯৬১	৪৩.৯২	১.৭৫
১৯৭১	৫৪.৮১	২.১৯
১৯৮১	৬৮.৩৩	২.৬৩
১৯৯১	৮৩.৩৯	৩.১২
২০০১	১০২.৭০	৩.৬৭
২০১১	১২১.৪২	৪.১৯

- সারণীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রতি দশ বছরে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে।
- ২০০১ এ জনসংখ্যা ১৯৫১ জনসংখ্যার প্রায় ৩ গুণ বেড়ে গেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের কী অসুবিধা হচ্ছে?

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণাম ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সবাই সবক্ষেত্রে সমান সুবিধা সুযোগ পাচ্ছে না। লোকের আবশ্যক মত বাসগৃহ নির্মাণের জন্য কৃষিজমির উপর কোপ পড়ছে ফলে, দিন দিন চাষজমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। বেশি পরিমাণে ফসল উৎপাদনের আশায় রাসায়নিক সার ও বিষাক্ত পোকামারা ওষুধের প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে।

মানুষের আবশ্যকতা পূরণের জন্য গড়ে উঠছে নতুন নতুন কলকারখানা। প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা ও যানবাহনের জন্য পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। জঙ্গল নষ্ট হচ্ছে। ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আবশ্যক মত হচ্ছে না। উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সকলের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা আশানুরূপ করা সম্ভব হচ্ছে না। বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। রুজি-রোজগার না থাকায় চুরি, ডাকাতি, গুন্ডারাজ বেড়ে চলছে। সামাজিক জীবনে এর কুপ্রভাব পড়ছে।

ভারতের স্বাধীনতার পরে কঠিন পরিশ্রম করে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি করেছি। তথাপি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রগতি উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কাজেই শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতে পারলে এ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।

আমরা কি শিখলাম ঃ

- গমনাগমন ও পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য আমরা একটি জায়গায় খুব শীঘ্র পৌঁছতে পারছি ও অন্য জায়গার সুযোগ সুবিধা উপভোগ করতে পারছি।
- টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার, রেডিও, দূরদর্শন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেল, ইন্টারনেট ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক সহজ ও উন্নত হয়েছে।
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রগতির বলে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যথা- মাইক্রোস্কোপ, আলট্রাসোনিক, এক্সরে, ECG, স্ক্যানিং ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে রোগ নিরূপণ ও এর প্রতিকার যথাসময়ে ও যথোচিত ভাবে হতে পারছে।
- আমাদের প্রগতির এক প্রধান প্রতিবন্ধক দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এর কুপ্রভাব পড়ছে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় জীবনের উপরে।
- বর্তমান ভারতের জনসংখ্যা ১২১ কোটির বেশি। এই দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- শান্তি, সহানুভূতি ও সহযোগিতার সঙ্গে কঠিন পরিশ্রম করলে পরিবার, অঞ্চল তথা দেশের মঙ্গল সাধন হয়।
- দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময় হেলমেট এবং চার চাকার গাড়ি চালানোর সময় সিট বেল্ট ব্যবহার করা কিন্তু আবশ্যক।
- মদ খেয়ে গাড়ি চালক ব্রিথালাইজার দ্বারা ধরা পড়লে জরিমানা আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্সও বাতিল করা যায়।

অভ্যাস

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১. কিসে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কম সময়ের মধ্যে হাল্কা মাল পরিবহন করা যায়?

ক) উড়োজাহাজ

খ) জাহাজ

গ) ট্রাক

২. কিসে করে বেশি লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে ?

ক) ট্রেন

খ) বাস

গ) ট্রেকার

৩. ভুবনেশ্বর থেকে ট্রেনে ভদ্রক যেতে হলে কোন্ রেলপথ দিয়ে যেতে হয় ?

____

____

৪. তুমি ৫ নম্বর জাতীয় রাজপথ ব্যতীত অন্য কোন পথ দিয়ে কটক থেকে ব্রহ্মপুর যাবে ?

____

____

৫. পারাদ্বীপ থেকে জাপানে কোন পথে লোহা পাথর রপ্তানী করা যায় ?

____

____

৬. তুমি যদি কলকাতা দেখতে যাও কোন্ কোন্ পথ দিয়ে যেতে পারবে ? সেই পথে যেতে চাওয়ার কারণ লেখো।

____

____

৭. জাতীয় রাজপথ এবং রাজ্য রাজপথের মধ্যে কি পার্থক্য ?

____

____

৮. ব্রিথালাইজারের কাজ কী ?

____

____

৯. কোন্ নিয়ম অনুযায়ী সিট বেল্ট না পরে গাড়ি চালালে গাড়ির ড্রাইভারকে কত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হয়?

----

১০. নীচের ছবিটি দেখে গাড়ি চালানো বিষয়ে পাঁচ লাইন লেখো।

----

১১. আজ মানুষ ঘরে বসেই দেশ বিদেশের খবর যার সাহায্যে জানতেপারে সেগুলির নাম লেখো।
যথাঃ টেলিভিজন

১২. আগের ও আজকের পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে ভিতরে কী কী তফাৎ?

---

১৩. চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

---

১৪. নিম্নলিখিত স্থানে ভিড় হওয়ার ফলে কী কী অসুবিধা হয়, দু'লাইনে লেখো।

ক) ডাক্তারখানা -

খ) রেলস্টেশন -

---

১৫. নীচের ছবিগুলো দেখো এবং সেগুলির জন্য তুমি কী কী সুবিধা পাচ্ছ তা ছবির পাশে লেখো।

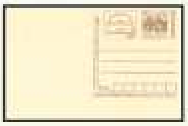

বাড়িতে অভ্যাস করে এসো ঃ

- তোমার গ্রাম/শহরের লোক সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার জন্য কি অসুবিধা হচ্ছে বড়োদের জিজ্ঞাসা করে লেখো।
- 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার'- এ কথা লোককে জানানোর জন্য দুটি স্লোগান লিখে নিয়ে এসো। শ্রেণী ঘরে তা'দেখাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য ও রোগ

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাবার খাই। সব রকমের খাবার উপযুক্ত পরিমাণে না খেলে আমাদের শরীরে খাদ্যসারের অভাব হয়। এর ফলে আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। এই রোগগুলিকে আমরা "খাদ্য অভাবজনিত রোগ" বা অপুষ্টি জনিত রোগ বলি।

আমাদের খাবারের প্রধান উপাদান - শ্বেতসার ও পুষ্টিসার অভাব হলে আমাদের কি কি রোগ হয় তা আলোচনা করে জেনে নেবো।

সারণি

খাদ্যসার	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
পুষ্টিসার	ক্বাসিত্তরকর	শিশুর হাত, পা ও মুখ ফুলে যায়, চামড়া শুকনো দেখা যায় ও চামড়ায় ঘা হয়। মাথার চুল পান্ডুবর্ণ হয় এবং চুল ধরতে ধরতে উঠে আসে।
শ্বেতসার	মারাস্‌মস্‌	হাত পা সরু হয়ে যায়। লম্বা হতে পারে না। ভীষণ খিদে হয়।

তুমি জেনে নাও ঃ

শ্বেতসার ও পুষ্টিসার যুক্ত খাবার আবশ্যক পরিমাণে খেলে অপুষ্টিজনিত রোগ হয় না। বিভিন্ন প্রকার খাবার থেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভিটামিন পাওয়া যায়। এগুলো আমাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন প্রকার রোগ হয়।

অপুষ্টি

জেনে নাও ঃ

ভিটামিন D র অভাব হলে বাচ্চাদের রিকেটস্ রোগ হয় এবং বয়স্ক লোকদের অস্থিওমালেসিয়া রোগ হয়।

ভিটামিন A, B, C, D ব্যতীত ভিটামিন E, K, B কমপ্লেক্স ইত্যাদি আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

ধাতুসার অভাব জনিত রোগ ঃ

আমাদের খাবার শাক, দুধ, ডিম, কলা, ছোটমাছ ইত্যাদি খাদ্য বস্তু থেকে আমরা ধাতুসার পাই, নুনেও ধাতুসার থাকে। এই সব খাবার থেকে আমরা সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, লৌহ, গন্ধক, ইত্যাদি ধাতুসার পাই। এর অভাবে রক্তহীনতা, অস্থিবাঁকা, গলা ফুলে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দেয় এবং বাচ্চার মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। এদের সংক্রামক রোগ বলা হয়।

এই সংক্রামক রোগগুলি ছোট ছোট জীবাণুর জন্য হয়। সেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সেগুলি দেখতে পাই।

সংক্রামক রোগ ছড়ায় কীভাবে?

সংক্রামক রোগ কয়েকটি মাধ্যম দ্বারা অসুস্থ ব্যক্তি থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রামিত হয়।

১. প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ দ্বারা ঃ

রোগীর জামাকাপড় ব্যবহার, রোগীর সঙ্গে মিশে খাওয়া এবং তার সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে কিছু রোগ সুস্থ লোকের মধ্যে সংক্রামিত হয়। চুলকানি, চর্মরোগ, কাশি, বসন্ত, মিলমিলা, বিভিন্ন যৌন রোগ ছোঁয়াছুঁয়ির দ্বারা সংক্রামিত হয়। এই সব ছোঁয়াচে রোগের প্রকোপ ঘনবসতি অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

২. **বায়ু মাধ্যমেঃ**

যক্ষ্মা, কাশি, সর্দি, বসন্ত, চোখউঠা, হুপিংকাশি, মিলমিলা, গলগন্ড ইত্যাদি অনেক রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগের জীবাণু রোগাক্রান্ত মানুষ থেকে কাশি, হাঁচি ও কফ ইত্যাদির মাধ্যমে অবাঞ্ছিত উপাদান বাতাসে মিশে যায়। তারপরে বায়ুমন্ডল থেকে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে তাকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। পাশের ছবিটি দেখ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিটি কাশতে কাশতে বমি করছে। তার পাশে শিশুটি খেলনা নিয়ে খেলছে। যার ফলে শিশুটি বায়ু প্রবাহিত সেই রোগে সংক্রামিত হবার বহুল সম্ভাবনা আছে।

৩. **খাদ্য মাধ্যমেঃ**

দূষিত খাবার খেলে বমি, পায়খানার মত পেটের অসুখ হয়। ধূলো পড়া, পচা এবং বাসি খাবার দূষিত হয়ে যায়। এতে রোগের জীবাণু জন্মাতে পারে। আর এ রকম খারাপ হয়ে যাওয়া খাবার খেলে পেটের অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. জলের মাধ্যমেঃ

কুয়ো, পুকুর, নদী নালা ইত্যাদির জল নানা কারণে দূষিত হয়। প্রায় অধিকাংশ রোগের কারণ দূষিত জল। যে জলে শরীরের ক্ষতিকর বিভিন্ন উপাদান ও রোগজীবাণু থাকে, তাকেই দূষিত জল বলা যায়। দূষিত জলে পায়খানা বমি, যকৃৎ ও টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের জীবাণু থাকে। এই জল সুস্থ লোকে খেলে বা ব্যবহার করলে ওদেরও এ সব রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জেনে রাখা ভালোঃ

কুয়ো, পুকুর ও নদীনালার জল ভাল করে ফুটিয়ে ও ছেঁকে খেলে রোগ থেকে অব্যহতি পাওয়া যায়। ১০ মিনিট পর্যন্ত জল ফুটলে জলে থাকা জীবাণু মরে যায়। তারপরে জল ঢেকে রাখলে জল জীবাণুমুক্ত হয়।

কাজেই — বিশুদ্ধ জল কর সেবন
নীরোগ রবে তোমার জীবন

তুমিও এভাবে আরও ২টি স্লোগান লিখে শ্রেণীগৃহের দেওয়ালে টাঙাও।

৫. কীটপতঙ্গের মাধ্যমেঃ

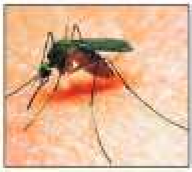

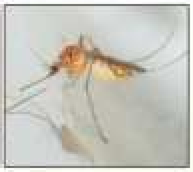

ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু, ইত্যাদি অসুখ মশা বহন করে আনে। মশা রোগীর দেহ থেকে রক্ত শুষে সুস্থ লোককে কামড়ালে সুস্থ লোকের শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে। ফলে ঐ মশার কামড় খাওয়া ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাছি রোগীর বমিতে বসবার পরে আমাদের আহার সামগ্রীতে বসে। আমরা সেই আহার খেলে পাতলা পায়খানা, বমি, যক্ষ্মার মত অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকে। এবার ভেবে বল, ডাক্তার রোগীর রক্ত ও মল পরীক্ষা করতে বলেন কেন ?

জেনে রাখা ভালোঃ

স্ত্রী এনাফিলিস মশা কামড়ালে ম্যালেরিয়া অসুখ ও ক্যালেক্স মশা কামড়ালে বাতের ব্যাথা থেকে জ্বর এবং এডিস্ মশা কামড়ালে ডেঙ্গু জ্বর হয়। ইঁদুর কামড়ালে প্লেগ রোগের সম্ভাবনা থাকে। এই রোগ হওয়া মাত্র রোগীর চিকিৎসা করা দরকার। ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের বহু সংখ্যক লোক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

কেঁচো, কৃমি - এরা জীবাণু নয়। এরা এক একটি কীট। এরা আমাদের শরীরে থাকলে শরীর অসুস্থ হয়। আমরা দুর্বল হয়ে পড়ি। এরাও অসুস্থ শরীর থেকে সুস্থ লোকের শরীরে ঢুকে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

বিভিন্ন প্রাণীদের দ্বারা ঃ পাগলা কুকুর ও শেয়াল কামড়ালে জলাতঙ্ক নামক সংক্রামক রোগ সংক্রমিত হয়।

৬. শরীরের কাটাদাগ বা ক্ষত মাধ্যমেঃ

আমাদের চামড়ায় যদি কোন কাটাছেঁড়া বা ক্ষত না থাকে, তবে চামড়ার ভিতর দিয়ে জীবাণু সহজে প্রবেশ করতে পারে না। যদি চামড়াতে ক্ষত থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি ও খুব সহজে জীবাণু সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে। ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু সুস্থ লোকের শরীরে এভাবেই প্রবেশ করে। এই রোগের প্রতিরোধের জন্য ঘা হবার ২৪ ঘন্টার ভিতরে ধনুষ্টঙ্কার নিরোধক ইঞ্জেকসন্ (এ.টি.এস) অ্যান্টি-টিটানস-সিরম নেওয়া আবশ্যক।

তুমি জান কী ?

ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু মাটি ও গোবরে থাকে। শরীরের কোনও ঘা-তে মাটি, গোবর বা আবর্জনা স্তুপের কোনও জিনিস লাগলে ধনুষ্টঙ্কার রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

৭. সম্পূর্ণ বিশোধিত না হওয়া ছুঁচ এবং সংক্রামিত সিরিঞ্জ মাধ্যমে ঃ

অধিকাংশ রোগ সুচারুরূপে বিশোধিত না হওয়া ছুঁচ ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সংক্রামিত ছুঁচ দিয়ে ইনজেক্সন নিলে অনেক সময় সুস্থ লোককেও রোগগ্রস্থ হতে দেখা যায়। এড্‌স এভাবেই ছড়িয়ে যায়।

সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ঃ

সংক্রামক রোগ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায় তার কয়েকটি উপায় ছবিতে দেখানো হয়েছে। এই উপায়গুলি হল -

১. সূর্যালোক ও বিশুদ্ধ বায়ু
২. পরিস্কার গৃহ
৩. ঢাকা দেওয়া খাবার
৪. গরম দুধ
৫. পরিস্কার শৌচালয়
৬. ঢাকনা দেওয়া ডাস্টবিন
৭. মশারী
৮. খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া।

উপরোক্ত উপায়গুলি দ্বারা সংক্রামক রোগ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

এসো, এবার আলোচনা করে দেখি, উপরোক্ত উপায়গুলি ব্যতীত অন্য উপায় আছে কি না।

ক) একজন থেকে আর একজনকে সংক্রমণ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা
খ) জীবাণুর বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা
গ) প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার ব্যবস্থা করা
ঘ) পরিবেশ দূষণ মুক্ত রাখা

সংক্রামক রোগ নিবারণে এগুলিও সাহায্য করে।

ক) এক জন থেকে অন্য জনকে সংক্রমণ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা ঃ

- রোগীকে আলাদা করে রাখা। ঘরের অন্য সদস্যদের রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে না আসা উচিৎ। রোগীকে দেখাশোনা করা লোকেরই সেখানে যাওয়া উচিত।
- রোগীর ব্যবহার করা কাপড়চোপড়, বাসনকুসন, সাবান পৃথক রাখা উচিত। জিনিসপত্রগুলি ব্যবহার করার পরে যথোচিত ভাবে পরিস্কার করা দরকার এবং অন্যরা সে সব যাতে ব্যবহার না করে সেদিকে নজর রাখা উচিত।
- সংক্রামক রোগী সম্পর্কে গ্রামের স্বাস্থ্যকর্মীকে জানানো ও রোগীকে আবশ্যকীয় সাবধানতা অবলম্বন করবার জন্য পরামর্শ দেওয়া আবশ্যক।

শিক্ষক কী করবেন ঃ

শিক্ষকরা শিশুদের সঙ্গে ছবিতে দেখানো উপায়গুলি কীভাবে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করবেন।

খ) জীবাণুর বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা ঃ

- আমাদের চারপাশে যত আবর্জনা জমছে সেগুলি একটি স্বতন্ত্র ড্রামে সংগ্রহ করে ঢেকে রাখা উচিত।
- স্নানঘর ও পরিস্রাগার সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ফিনাইল ও ডেটল দিয়ে সংক্রমণ মুক্ত করা উচিত।
- পানীয় জল ফুটিয়ে কোনো পাত্রে ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত।
- খাদ্যবস্তু উপযুক্ত ভাবে ঢাকা দিয়ে রাখা উচিত যাতে ধূলো বালি ও মাছি খাদ্য উপরে বসতে না পারে।
- খাদ্য গরম করে খাওয়া।
- বাড়ির চারপাশে আবর্জনা মুক্ত রাখা উচিত এবং ড্রেনগুলি ঢেকে রাখা আবশ্যক।

গ) প্রতিষেধক টীকা নেওয়ার ব্যবস্থা ঃ

আজ পর্যন্ত তুমি কী কী টীকা নিয়েছ ? ভেবে কিংবা মা বাবার কাছ থেকে জেনে লেখো।

সারনি

টীকার নাম	কোন্ রোগের প্রতিষেধক

আমাদের কতগুলি জীবাণুজনিত রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রতিষেধক টীকা নিতে হয়। কিন্তু এই টীকা আবার উপযুক্ত সময়ে না নিলে ভবিষ্যতে সেই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তার ফলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

টীকা নিলে কী হয় ?

টীকা নিলে শরীরের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বেড়ে যায়। সেজন্য শিশুদের ডিপথেরিয়া, ঘুংড়ি কাশি, ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও, মিলমিলা, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারের তরফ থেকে বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কলেরা, যক্ষা, যন্ডিস্ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়।

জন্ম থেকে ১০ বছরের মধ্যে কী কী টীকা নেওয়া উচিত তা নীচের সারণীতে দেওয়া হয়েছে।

সারনি

বয়স	টীকার নাম	রোগের নাম
জন্মানোর সময়	বি.সি.জি. পোলিও '০' মাত্রা	যক্ষ্মা পোলিও
জন্মের ১ মাস পরে	ডিপিটি-১ম	ডিপথেরিয়া, ঘুংড়ি কাশি ধনুষ্টঙ্কার
জন্মানোর সময় না নিলে	পোলিও-১ম হেপাটাইটিস বি-১ম	পোলিও হেপাটাইটিস
জন্মের ২ মাস পরে	ডিপিটি-২য় পোলিও-২য় হেপাটাইটিস বি-৩য়	ডিপথেরিয়া, ঘুংড়ি কাশি ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও হেপাটাইটিস
জন্মের ৩মাস পরে	ডিপিটি-৩য় পোলিও-২য় হেপাটাইটিস বি-৩য়	ডিপথেরিয়া, ঘুংড়ি কাশি ধনুষ্টঙ্কার, পোলিও হেপাটাইটিস
জন্মের ৯ থেকে ১২ মাসের মধ্যে	মিলমিলা ভিটামিন-এ -১ম বার	মিলমিলা রাতকানা
জন্মের ১৬-২৪ মাসের মধ্যে	ডিপিটি বুস্টার পোলিও বুস্টার	ডিপথেরিয়া, হাঁপানি, ধনুষ্টঙ্কার পোলিও
শিশুর ৫ বছর বয়স হলে	ডিটি	ডিপথেরিয়া, টিটানস
১০ বছর হলে	টি.টি (টিটানস অক্সাইড)	টিটানস
১৬ বছর হলে	টি.টি	টিটানস

বয়স অনুসারে টীকা নেওয়ার তালিকা

ঘ) সকলে মিলে পরিবেশ পরিস্কার রাখা ঃ

খোলা জায়গায় স্তূপীকৃত আবর্জনা মশা ও মাছির বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত স্থান। সংক্রামক রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এদের বংশবৃদ্ধি রুখতে হবে। সেজন্য আমাদের বাড়ির চারপাশের পরিবেশ যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। আশেপাশে জমে থাকা নোংরা আবর্জনা ও নালা নর্দমার নিয়মিত সাফাই হলে চারপাশের পরিবেশ নির্মল থাকবে ও সকলে সংক্রামক রোগ থেকে রক্ষা পাবে। এই সাফাইয়ের কাজ কিন্তু সকলে মিলে মিশে করা উচিত। তুমিও তোমার অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বচ্ছতার সুফল বিষয়ে বুঝিয়ে বলবে। মনে রেখো, ''সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।''

এবার দেখি আমরা কী শিখলাম ঃ

- খাদ্যের মধ্যে থাকা খাদ্যসারগুলি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে।
- আমাদের খাদ্যে খাদ্যসারের অভাব ঘটলে আমরা খাদ্য অপুষ্টিজনিত রোগে পীড়িত হতে পারি।
- কোয়াসিওরকর ও মারাস্‌মস্‌ অপুষ্টিজনিত রোগ।
- যে রোগ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি থেকে সুস্থ লোকের মধ্যে সংক্রমিত হয় তাকে সংক্রামক রোগ বলা হয়।
- সংক্রামক রোগ জীবাণু দ্বারাই সৃষ্টি হয়।
- সংক্রামক রোগগুলি প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ, বাতাস, দূষিত খাদ্য ও জল, কীট পতঙ্গ ও বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

সংক্রামক রোগ বাড়তে না দেওয়ার উপায় -

— জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ করা

— অসুস্থ লোকের জীবাণু যাতে সুস্থ লোকের মধ্যে সংক্রমিত না হয় তার ব্যবস্থা করা

— প্রতিষেধক টীকা নেওয়া

— দলগতভাবে সাফাই করে পরিবেশ পরিস্কার রাখা।

অভ্যাস

১. ঠিক উক্তির জন্য পাশের খালি ঘরে টিক (✓)চিহ্ন ও ভুল উক্তির জন্য (✗) চিহ্ন দাও।

ক) অনেক জীবাণু রোগ সৃষ্টি করে। ☐

খ) যক্ষ্মা রোগ জলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ☐

গ) ধনুষ্টঙ্কার না হওয়ার জন্য এ.টি.এস. দেওয়া হয়। ☐

ঘ) রক্তহীনতা ধাতুসারের অভাবে হয়। ☐

ঙ) অপুষ্টি জীবসার অভাবে হয়। ☐

২. সারণীর খালি ঘর পূরণ কর ঃ

রোগের নাম	কীভাবে ছড়ায়
যক্ষ্মা	বাতাস, প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ
ম্যালেরিয়া	
প্লেগ	

৩. ক্ষতিকর রোগের লক্ষণ কী?

৪. ঠিক উত্তরের চারপাশে গোল বুলাও।

ক) নিম্নলিখিত কোন জল রোগের উৎস নয়?

১) নদী ২) পুকুর ৩) গভীর নলকূপ

খ) নিম্নলিখিত কোন রোগ জলের দ্বারা ছড়ায়?

১) যক্ষ্মা ২) বসন্ত ৩) কলেরা।

৫. কীসের মাধ্যমে কোন রোগ ছড়ায় লেখো।

মাধ্যম	ছড়িয়ে পড়া রোগ সমূহ
জল	
মশা	
মাছি	

৬. টীকা কেন নেওয়া হয় ?

৭. আজকাল একই দিনে সারা ভারতে জন্ম থেকে ৫ বয়সের সব শিশুকে পোলিও ড্রপ দেওয়া হচ্ছে, কারণ কী ?

৮. ভেবে লেখো —

ক) ধনুষ্টঙ্কার রোগ না হওয়ার জন্য কী করবে ?

খ) শোওয়ার সময় আমরা কেন মশারি টাঙাই ?

গ) আমরা শুধু ভাত না খেয়ে তার সঙ্গে ডাল, তরকারি প্রভৃতি খাই কেন ?

ঘ) বসন্ত রোগীর জামাকাপড় গরম জলে ধোওয়া হয় কেন ?

৯. তোমার গ্রামে একজন লোক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত, অন্য লোক যাতে রোগে পীড়িত না হয় সেজন্য তুমি কী ব্যবস্থা নেবে ?

বাড়িতে বসে করো ঃ

- তোমার অঞ্চলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ডাক্তারখানা গিয়ে জন্ম থেকে দশ বছর পর্যন্ত যে শিশুরা টীকা নিয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- খবর কাগজে বেরোনো বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যগুলি কেটে তোমার খাতায় আঠা দিয়ে সেগুলি লাগাও ও বন্ধুদের সঙ্গে সে বযিয়ে আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আবর্জনার নিষ্কাশন ও সদুপযোগ

তুমি রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে, নর্দমাতে, বাগানে, পার্কে পথিলিন থলি, গুটকা প্যাকেট, ছেঁড়া কাপড়, ভাঙা কাঁচ, প্লাস্টিক বোতল ও ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ইত্যাদি চারিদিকে পড়ে থাকতে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ। এসব শুধু যে পরিবেশকে নোংরা করে তাই নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার উপরেও কু-প্রভাব পড়ে। আমাদের জীবনযাত্রার যত উন্নতি ঘটছে সেই অনুপাতে আমরা অনেক বেশি আবর্জনা জমিয়ে তুলছি।

বাড়িতে ঝাঁট দেওয়ার পরে কী কী আবর্জনা বেরোয় লেখো।

বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, জলখাবারের দোকান, কলকারখানা ও মন্দিরথেকে যে সব আবর্জনা বেরোয় সাবনিতে লেখো।

সারনি

বিদ্যালয়	ডাক্তারখানা	জলখাবারের দোকান	কলকারখানা	মন্দির

এ ছাড়া আর কী কী আবর্জনা তুমি দেখেছ, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

বিদ্যালয়, বাড়ি, ডাক্তারখানা, মন্দির প্রভৃতি স্থানের আবর্জনার মধ্যে কী কী মাটিতে মিশে যায় আর কী কী মাটিতে মেশে না, তা পৃথক করে লেখো।

সারণী

মাটিতে মিশে যায়	মাটির সঙ্গে মেশে না

আজকাল এতো আবর্জনা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেলেখো।

কয়েক বছর আগে মানুষ হাটে যাওয়ার সময় বাড়ি থেকে কাপড়ের থলি নিয়ে যেতো কিন্তু আমরা এখন প্লাস্টিকের থলি ব্যবহার করছি। আগে দোকানী আমাদের কাগজের ঠোঙাতে জিনিস দিত কিন্তু এখন পলিথিনের ব্যাগে জিনিস দেয়। আমাদের দৈনিক ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক জিনিস পথিলিন প্যাকেটে পাওয়া যায়। এই পথিলিনই আবর্জনার মূল কারণ।

এই আবর্জনার পরিমাণ কমানোর জন্য তুমি কী করতে পারবে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

যেমন - পথিলিন ব্যাগের বদলে কাপড়ের ব্যাগ ও কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করা।

■ নোংরা ডিবা বা ডাস্টবিনে না ফেলে বাইরে ফেললে কী হবে?

আবর্জনা নিষ্কাশন করবে কীভাবে?

বাড়ির অনাবশ্যক জিনিসগুলো আলাদা আলাদা করে রাখো। মাটিতে মিশে যেতে পারে এমন জিনিসগুলি অন্য এক ভাগে রাখো। এর পর মাটিতে যে সব জিনিস মিশতে পারে না সেগুলি দুভাগে বিভক্ত কর। একটিতে যেগুলো আবার ব্যবহার করা যেতে পারে ও অন্য ভাগে আবার ব্যবহার করা যাবে না সেই জিনিসগুলি রাখো।

এবার এসো, ভাগ ভাগ করে রাখা অদরকারী জিনিসগুলি আলাদা আলাদা তিনটি ডিবা বা ডাস্টবিনে রাখবো।

তুমি জানো কী?

পুনরাবৃত্তঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্জবস্তুগুলি খুব কম পরিষ্কার করে বা যথোচিত পরিষ্কার না করে বিভিন্ন কাজে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার উপযোগী করা হচ্ছে। এই কাজকে বর্জবস্তুর পুনরাবর্তন বলা যায়।

মাটিতে মিশে যাওয়া

পুনঃ ব্যবহারযোগ্য (মাটিতে মেশে না)

পুনঃ ব্যবহার অযোগ্য (মাটিতে মেশে না)

- মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া আবর্জনা মাটি খুঁড়ে পুতে ফেলা উচিত।
- গ্রামের প্রত্যেক ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে নোংরা জল শুষে নেওয়ার মত গর্ত বা সোকপিট্‌ ও ময়লা খাত করা দরকার।
- তোমার বিদ্যালয়ে পুঞ্জীকৃত আবর্জনা তুমি কীভাবে নিষ্কাশন করবে আলোচনা করে লেখো।

এসো, এবার দেখা যাক, পৌরাঞ্চলে আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য কী কী ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গাড়িতে আবর্জনা বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

পৌরাঞ্চলে সাফাই কার্য

রাস্তার ধারে ডাস্টবিনের ব্যবহার

ছবি দেখে পৌরাঞ্চলে আবর্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিষয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

শিক্ষকদের জন্য সূচনা ঃ

শ্রেণীগৃহে শিশুরা টুকরো কাগজ, কালি ফুরিয়ে যাওয়া অব্যবহার্য কলম, কাটা পেনসিলের টুকরো, ভাঙা স্কেল, ছেঁড়া চাটাই, ইত্যাদি রাখবে। বিদ্যালয় চত্বরে তিনটি রঙের ডিবা রেখে আবর্জনা আলাদা আলাদা করে ঢাকবে। মাটিতে মিশে যাওয়া আবর্জনা গর্ত করে পুঁতে দেবে। আবশ্যক স্থলে স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তা নিয়ে আবর্জনা নিষ্কাশন করা সম্পর্কে শিক্ষক আলোচনা করতে পারেন।

পৌরাঞ্চলে পৌরসংস্থার কর্মীরা আবর্জনা নিয়ে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে জমা করে। আবর্জনা শুকিয়ে গেলে তারা পুড়িয়ে দেয়। এগুলো না পুড়িয়ে পুতে দেওয়া ভাল। কোন কোন শহরে বর্ষার জল ও নোংরা জল সংগ্রহের জন্য মাটির নীচে ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবর্জনার সদুপযোগ ঃ

কিছু অদরকারী পদার্থ আমরা ব্যবহার করতে পারি। বিভিন্ন প্রকার ধাতু ও প্লাস্টিকের তৈরি জিনিস এখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন না করে সেগুলি পুনরায় ব্যবহারের জন্য কলকারখানায় পাঠানো যেতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত খালি টিন, কাগজের পেটি, পিচবোর্ড, নারকেল ছোবড়া, নারকেল খোলা, তালশাঁসের খোসা ও তালের আঁঠি থেকে আবর্জনা পাত্র, ফুলদানি, পেনস্ট্যান্ড ও গৃহসজ্জা উপকরণ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

ওই রকম আবর্জনা দিয়ে তুমি কী কী জিনিস তৈরী করতে পারবে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আবর্জনার নাম	প্রস্তুত জিনিসের নাম
তালাশাঁসের খোসা	খেলনা, মাথার খুলি

তুমি জানো কী?
পায়খানা, গোশালা বা গোয়ালের গোবর জৈবিক বাস্প ও সার তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

শিল্পী নেকচান্দ চণ্ডীগড়ের বিখ্যাত প্রস্তর উদ্যান নির্মাণ করেছেন। প্রথমে তিনি কয়েক বছর ধরে স্তুপীকৃত আবর্জনা থেকে বস্তু সংগ্রহ করলেন। তারপর সেসব সংগৃহীত বস্তুসামগ্রী দিয়ে উদ্যান নির্মাণ করলেন। প্রত্যেক বছর দেশ বিদেশ থেকে অনেক লোক সেই উদ্যান দেখতে আসেন।

আজকাল কিছু কলকারখানা থেকে ফেলে দেওয়া অনাবশ্যাক বর্জ পদার্থ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। তালচেরের তাপবিদ্যুৎ কারখানা ও অনুগুলের অ্যালমুনিয়াম কারখানা থেকে প্রচুর পাঁশ বেরোয়। তেমনি রাউরকেলার ইস্পাত কারখানা থেকে প্রচুর 'খাদ' (স্ল্যাগ) বেরোয়। তা' আমরা কয়লা তুলে নেওয়ার পরে খনির সেই ফাঁকা জায়গা ও রাস্তাঘাট নির্মাণের কাজে ব্যবহার করি।

আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট আবর্জনা পাত্রে ফেলা দরকার। আজকাল তা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জৈবিক গ্যাস ও জৈবিক সারের মত মূল্যবান প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হচ্ছে।

আমরা কী শিখলাম ঃ

আবর্জনার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। অতএব এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

কিছু আবর্জনা আছে যা মাটিতে মিশে যায়, আবার কিছু আছে যা মাটিতে মেশে না আবার কিছু আবর্জনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে।

আবর্জনার প্রকার ভেদ অনুসারে আলাদা আলাদা করে রাখা উচিত।

পুনর্বার ব্যবহারযোগ্য আবর্জনা কলকারখানায় পাঠানো হয়।

কিছু অদরকারী জিনিস ব্যবহার করে নতুন জিনিস তৈরি করা হয়।

অভ্যাস

১. অদরকারী কাগজ থেকে প্রস্তুত যে কোনও তিনটি জিনিসের নাম লেখো।

------------------ , ------------------ , ------------------ ,

২. নিম্নোক্ত আবর্জনার মধ্যে কোনটি মাটিতে সহজে মিশে যায়।

ক) প্লাস্টিক ব্যাগ

খ) চামড়া ব্যাগ

গ) কাগজ ঠোঙা

৩. কোন্‌টি আবর্জনা সৃষ্টি করতে কম সাহায্য করে?

ক) কাঠের চৌকি

খ) প্লাস্টিক চৌকি

গ) লোহার চৌকি

৪. আবর্জনা নিষ্কাশন না করলে কী কী অসুবিধা হবে?

৫. পৌরাঞ্চলে আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

৬. তোমার বিদ্যালয়ের মধ্যাহ্ন ভোজন পরে কী কী আবর্জনা বেরোয়?

ঘরে করার কাজঃ

- অদরকারী জিনিস থেকে যে কোনো দুটি উপকরণ প্রস্তুত করে শ্রেণীগৃহের শিক্ষণ সামগ্রীর জায়গায় রাখ।
- তুমি নিজে কাগজ আবর্জনা ব্যবহার করে একটি সুন্দর বাগানের কোলাজ (টুকরা কাগজ জোড়া দিয়ে) চিত্র প্রস্তুত কর এবং বিদ্যালয়ের দেওয়ালে লাগাও।
- বিদ্যালয়ে কম্পোষ্ট খাত তৈরি কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিপর্যয় ও সুরক্ষা

চিত্র - ১

চিত্র - ২

উপরোক্ত চিত্র দুটিতে যা দেখছ সেগুলি নীচের সারনিতে লেখো।

চিত্র - ১

চিত্র - ২

চিত্র দু'টিতে আমরা দেখলাম, বন্যার জন্য মানুষ কিভাবে হয়রান হয়। তেমনি প্রচন্ড খরার সময়েও কিভাবে তারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখে। এভাবেই আমরা সাধারণ এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই এবং তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিই।

ঝড় ঃ সমুদ্র পতনের তাপমাত্রা এবং জলীয় বাষ্প মিশ্রণে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হওয়ার ফলে এক লঘুচাপ সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে তা ঝড়ের (বাত্যা) রূপ নেয়। এই ঝড়ের ফলে বাতাসের বেগ প্রবল আকার ধারণ করে এবং প্রচন্ড বৃষ্টি পাত হয়। ফলে নদী / নালায় প্রবল বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে জনজীবন ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘুর্ণি ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রস্তুতি ঃ

- স্থানীয় বহুমুখী আশ্রয় স্থলে পরিবারের সদস্য সহ মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে চলে যাওয়া আবশ্যক।
- অত্যাবশ্যক জিনিস যেমন খাদ্য পদার্থ, খাওয়ার জল সঙ্গে রাখা আবশ্যক।
- গৃহপালিত পশুদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত
- এই সময়ে বড় গাছ, বিদ্যুৎ খুঁটি, ভাঙাঘর ও জল থেকে দূরে থাকা উচিত।
- রেডিও, টেলিভিজন ও খবর কাগজ ইত্যাদি বিভিন্ন গণমাধ্যম দ্বারা প্রচারিত ঝড়ের পূর্বাভাস প্রতি সজাগ থাকা।
- আশ্রয়কারীদের আশ্রয় স্থলী বা প্রভাবিত গ্রামের পরিবেশ স্বচ্ছ রাখার জন্য গ্রামের লোকেরা সতর্ক থাকবে।
- বন্যার জন্য নদী নালাতে অনেক বিষাক্ত সাপ তথা জীবজন্তু বসতি অঞ্চলে চলে আসে।
- সুতরাং সাপের কামড় থেকে সাবধান থাকা আবশ্যক।

ভূমিকম্প ঃ

প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে সৃষ্ট কম্পনকে সাধারণতঃ ভূমিকম্প বলা হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশী হলে তা' বেশী মাত্রায় মানুষের জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়

ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় ঃ

- বিদ্যালয় বা বাড়ির ভিতরে থাকলে সঙ্গে সঙ্গে খোলা জায়গায় যাওয়া আবশ্যক।
- ভূমিকম্প হচ্ছে বুঝতে পারলে টেবিল বা কোন মজবুত আসবাব পত্রের তলায় আশ্রয় নাও।
- ছাদ কিংবা দেওয়ালে লেগে থাকা জিনিসগুলি থেকে দূরে থাক।
- যদি বাইরে থাক, তবে পাকা ঘরের দেওয়াল, বিদ্যুতের তার ও গাছ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকবে।

জেনে নাওঃ

সুনামী ঃ সমুদ্র ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হওয়া উপকূল অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসা উত্তাল তরঙ্গকে সুনামী বলা হয়। এজন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হয়।

অভ্যাস

১। নীচের ছবিটি দেখে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

এই ছবিটি কোন্ বিপর্যয়কে বোঝাচ্ছে?

এই বিপর্যয়ের ফলে কি কি ক্ষতি হয়	কি কি সাবধানতা নেওয়া যেতে পারে

২। নীচের বাক্যগুলি উপযুক্ত কুঠরিতে লেখো।

খোলা স্থানে থাকলে দ্রুত পাকাঘর / আশ্রয়স্থলীতে চলে যাও।

বিদ্যালয় বা বাড়ির ভিতরে থাকলে তাড়াতাড়ি খোলা জায়গায় যাও।

ছাদ তথা দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকা জিনিসগুলির সামনে থেকে সরে যাও।

অত্যাবশ্যক জিনিস নিজের সঙ্গে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া।

ভূমিকম্প	বাত্যা

তোমার কাজ

তুমি বিদ্যালয়ে পড়ার সময় হঠাৎ ভূমিকম্প অনুভূত হলে তোমার সুরক্ষার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

প্রাথমিক চিকিৎসা

তুমি ঘরে ও বাইরে বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছ। সেগুলি নীচে লেখো।

যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ডাক্তারখানায় পৌঁছনোর পূর্বে আমরা সাধারণতঃ প্রথমে কিছু নামমাত্র চিকিৎসা করি। একে প্রাথমিক চিকিৎসা বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে —

- আহত ব্যক্তির কষ্ট লাঘব করা।
- অবস্থার উন্নতি করা।

প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কিছু উপকরণ আবশ্যক। এই উপকরণ সাধারণতঃ একটি বাক্সে থাকে। এই বাক্সকে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বলা হয়। এতে তুলা, ব্যান্ডেজ, কাপড়, আয়োডিন, কাঁচি, ছোট সাবান, ডেটল ইত্যাদি থাকে। এছাড়া জ্বর, মল ও বমির জন্য কিছু প্রাথমিক ওষুধও থাকে।

দুর্ঘটনা ঘটলে কী কী প্রাথমিক চিকিৎসা দরকার হয়, এবার সে বিষয়ে আলোচনা করি। মনযোগ দিয়ে শোন।

কুকুর কামড়ালে

- প্রথমে কাটা জায়গাটি সাবান বা ডেটল দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
- কাটা জায়গাটি ব্যান্ডেজ কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে।
- ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

জেনে রাখা ভালো ঃ
কুকুর কিংবা শিয়াল কামড়ালে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে অতি শীঘ্র ইঞ্জেকশন্ নেওয়া উচিত, নচেৎ জলাতঙ্ক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তোমার অঞ্চলে অনেক লোকই ঘরে নিশ্চয় কুকুর পোষে। তারা কুকুরকে কী ইঞ্জেকশন দেয় ও কেন দেয় জিজ্ঞেস করে লেখো।

নাক থেকে রক্ত বেরোলে ঃ

- মুখ দিয়ে শ্বাস নেবে
- নাক জল দিয়ে ধুতে হবে
- মাথা উঁচু করে রাখবে
- ভিজে কাপড় নাকের উপরে রাখবে
- নাকের যে ফুটো দিয়ে রক্ত বেরোবে তাকে জোরে চেপে ধরবে।

দুর্ঘটনা | প্রাথমিক চিকিৎসা

হাতে ফটকা ফুটলে

রান্নার সময় কাপড়ে আগুন লাগলে

কোন্ দুর্ঘটনার জন্য কী ব্যবস্থা করা হয়েছে ছবি দেখে লেখো।

এর থেকে আমরা জানলাম —

কোন দুর্ঘটনায় হাত কিংবা পা পুড়ে গেলে পোড়া জ্বালার কষ্ট কমা পর্যন্ত ক্ষত স্থান ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখবে কিংবা পোড়া স্থানে বরফ দিয়ে রাখবে। কিন্তু গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলে শরীর সঙ্গে সঙ্গে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখবে।

জলে ডুবে গেলে

ছবি দেখে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

এসো, আরো কিছু দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জানবো।

বিষাক্ত খাদ্য খেলে ঃ

অনেক সময় লোকেরা বিষাক্ত খাদ্য খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিষাক্ত খাদ্য পেটে জমলে শরীরের ক্ষতি হয়। তাই এই বিষাক্ত খাদ্য বমি করিয়ে বের করে দেওয়া ভাল। মুখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে বা পটাশের জল খেলে বমি হয়।এরপর ডাক্তার দেখানো দরকার।

বিছা বা বিষাক্ত কীট কামড়ালে ঃ

বিছা, বোলতা বা বিড়াল কামড়ালে খুব যন্ত্রণা হয়। এ সময় ক্ষত স্থান বারম্বার চুনের জলে ধুলে বা চুনের জলে ভিজিয়ে কাপড় জড়িয়ে রাখলে যন্ত্রণা কমে যায়।এরপর ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করবে।

সাপ কামড়ালে ঃ

কী করা উচিত ঃ

সাপ কামড়ানো ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতে হবে। কারণ বিষাক্ত সাপ কামড়ালেও সবসময় প্রাণঘাতী নাও হতে পারে। সাপ কামড়ানো স্থানে পরে থাকা আঙ্টি, ঘড়ি, মাদুলি, তোড়া ইত্যাদি খুলে দাও। ক্ষত স্থানের উপরে ক্রেপ ব্যান্ডেজের
(তা না থাকলে পাতলা লম্বা কাপড়) হালকা ভাবে গুড়িয়ে গুড়িয়ে বাঁধতে হবে। হাতে কামড়ালে বুকের নীচে ঝুলিয়ে রাখ। পায়ে কামড়ালে, পা সোজা করে রাখ এবং সেই লোককে চ্যাংদোলা করে তুলে ধর। সাপের বিষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্প বিষ নিরোধক ইঞ্জেকসন্ (ASV) ই একমাত্র বিকল্প সুতরাং যথাশীঘ্র রুগীকে ডাক্তার খানায় নিয়ে যাওয়া উচিত। ডাক্তার খানা যাওয়ার পথে রুগীর শরীরে দেখতে পাওয়া লক্ষণ ডাক্তারকে সবিশেষ বল।

কী করা অনুচিত ঃ

আদৌ ভয় পাবে না কিংবা বিচলিত হবে না। রূগীকে চলাফেরা বা কোনো কাজ করতে দেবে না। ক্ষত জায়গাটি ধোবে না , বরফ কিংবা ইলেকট্রিক সক্ দেবে না। ওঝা-গনৎকার, মন্দিরে জল ঢালা, বিষ ঝাড়া, ঝাড় ফুঁক, তুক - তাক ইত্যাদি কাজে সময় অপব্যায় করবে না। ক্ষত জায়গাটি বাঁধবার জন্য সুতুলি, নারকেল দড়ি ইত্যাদি ব্যবহার কোর না। ব্লেড, ছুরি ইত্যাদি অস্ত্র দিয়ে ক্ষতস্থান কাটাকুটি কোর না। ক্ষত জায়গায় মুখ লাগিও না কিংবা টিপাটিপি কোর না। খাবার জিনিস কিছু খেতে দিও না।

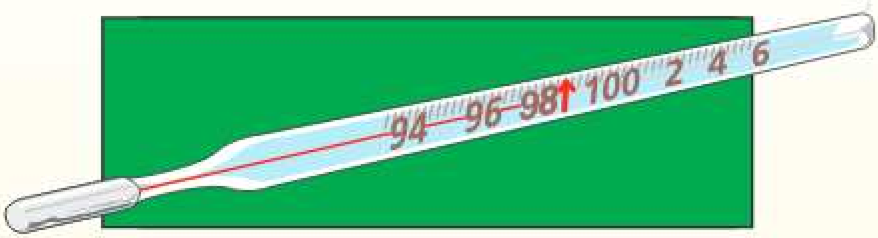

■ উপরের ছবিটিকে আমরা কি বলি? ______________________

■ একে আমরা কোন কাজে ব্যবহার করি? ______________________

থার্মোমিটারের ছবিটি দেখো। এতে পারদ নামে এক তরল ধাতু আছে। এই ধাতু গরম হলে কাঁচের নল ভিতরে প্রসারিত হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। একে আমরা কাঁচের বাইরে থেকে দেখতে পাই। পারদের এই প্রসারণের দ্বারা আমরা শরীরের তাপমাত্রা জানতে পারি।

তোমার ব্যবহৃত স্কেলের চিহ্নের মত এতে কয়েকটি ছোট ও বড় দাগ দেওয়া হয়। সবচেয়ে নীচের চিহ্নের পাশে ৯৫°F চিহ্নের পাশে ১১০°F লেখা থাকে। দুটি চিহ্নের মাঝের অংশকে ১৫ ভাগে বিভক্ত করে ৯৬°F, ৯৭°F, ৯৮°F ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে এক একটি বড় দাগের নীচে লেখা থাকে। আবার প্রত্যেক ডিগ্রীকে ১০ ভাগে বিভক্ত করে চিহ্নিত করা হয়।

আমাদের শরীরের সাধারণ তাপমাত্রা ৯৮.৪°F থার্মোমিটারে এই ডিগ্রী জানিয়ে দেওয়া দাগটি লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের শরীরের তাপমাত্রা জানার জন্য আমরা থার্মোমিটার ব্যবহার করি।

■ শরীরের তাপমাত্রা বেশি হলে রোগীর মাথা ধুয়ে দিতে হয়, কারণ কী জিজ্ঞাসা করে লেখো।

____

এসো থার্মোমিটার সম্পর্কে জেনে নাও।

- থার্মোমিটার ব্যবহার করার আগে ও পরে ভাল করে ধুয়ে নাও।
- থার্মোমিটারের উপর দিকের অংশটুকু ধরে আস্তে আস্তে ঝেড়ে নাও যেন পারদ চিহ্ন তীর চিহ্নের নীচে নেমে আসে।
- জ্বর মাপার জন্য এটি জিভের নীচে অথবা বগলের মধ্যে দু' মিনিট ধরে রাখো।
- দু' মিনিট পরে থার্মোমিটার বের করে পারদ স্তম্ভ কত দূর পর্যন্ত গেছে, তা দেখে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

শিক্ষকের জন্য সূচনা ঃ

শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের থার্মোমিটার দেখাবেন ও প্রত্যেক ডিগ্রীকে দশ ভাগে বিভক্ত হওয়া অংশ দেখাবেন। °F ও °C যথাক্রমে ফারেনহাইট ও সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার বলে শিক্ষার্থীদের বোঝাবেন।

তুমি জানো কী ?

- আজকাল শরীরের তাপমাত্রা জানার জন্য ডিজিটাল থার্মোমিটার বেরিয়েছে।

পাতলা পায়খানায় অসুস্থ শিশুর জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা ঃ

তোমার পরিবারে অথবা প্রতিবেশী ঘরে শিশুদের পাতলা পায়খানা রোগে আক্রান্ত হতে নিশ্চয় দেখেছ। পাতলা পায়খানা হলে শিশুর শরীর থেকে জলীয় অংশের পরিমাণ কমে যায়। ফলে, শিশুটি দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশুর শরীরে জলীয় অংশের অভাব পূরণ করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

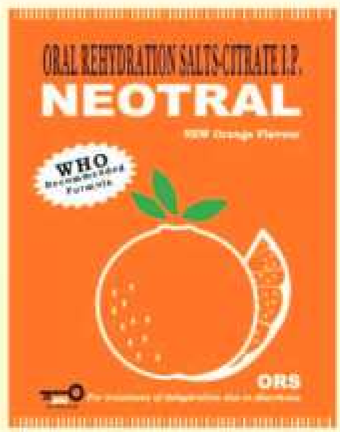

নুন ও চিনি জল ঃ

ঠান্ডা হওয়া ফুটানো জল থেকে এক গ্লাস নিয়ে তাতে এক চামচ চিনি ও এক চিমটা নুন মিশিয়ে বার বার খেতে দেওয়া ।

- ডাবের জল, ঘোলের জল ও পান্তা ভাতের জল দিতে হবে।
- দোকান থেকে ও.আর.এস প্যাকেট এনে জলে তা মিশিয়ে খেতে দেওয়া।
- এরপরে শীগগির ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আমরা কী শিখলাম ঃ

- দুর্ঘটনাগ্রস্ত আহত ব্যক্তিকে ডাক্তারখানা নেওয়ার আগে সাময়িক কিছু চিকিৎসা করতে হয়। যার ফলে আহত ব্যক্তির অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। একে প্রাথমিক চিকিৎসা বলা হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা জানার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।
- শিশুর পায়খানা হলে শিশুকে চিনি ও নুন মেশানো জল খেতে দেওয়া হয়। এর সাথে শিশুকে ও.আর.এস. -এর জলও দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের জলীয় অংশের পরিমাণ কিছু মাত্রায় বেড়ে যায়।

অভ্যাস

১) ঠিক উক্তির ডান পাশে (✓) চিহ্ন ও ভুল উক্তির ডান পাশে (✗) চিহ্ন দাও।

ক) প্রাথমিক চিকিৎসা কেবল ডাক্তারের দ্বারা করা হয়।

খ) থার্মোমিটারে শরীরের তাপমাত্রা মাপা যায়।

গ) শিশুর পাতলা পায়খানা হলে জল ও খাবার খেতে দেওয়া হয়।

ঘ) নাক দিয়ে রক্ত পড়লে মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।

ঙ) জলে ডুবে যাওয়া লোককে উপরে এনে চিত করে শোওয়ানো দরকার।

২) প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে থাকা তিনটি জিনিসের নাম লেখো।

______________ ______________ ______________

৩) থার্মোমিটারের ছবি আঁক।

৪) কারণ কী বল ঃ

ক) থার্মোমিটার জিভের নীচে বা বগলে ২ মিনিট থেকে কম সময় রাখা হয় না।

খ) সাপ কামড়ালে কামড়ানো জায়গার উপর ও তলার অংশ বেঁধে দেওয়া হয়।

৫) কী করবে লেখো ঃ

ক) আগুনে আঙুল পুড়ে গেলে -

খ) শিশুটি জলে ডুবে গেলে -

গ) মাথা ফেটে গেলে -

বাড়িতে করে এনো ঃ

সর্দিগরমিতে আক্রান্ত হলে কী কী প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, একটি ড্রইং সিটে তা লিখে বিদ্যালয়ের দেওয়ালে টাঙাও।

ষোড়শ অধ্যায়

সবাই একই রকম নয়

চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মত প্রত্যেক জাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ের মধ্যেই কিছু বিশিষ্ট গুণ থাকে। বাসস্থান অনুযায়ী সে গুণাবলীর তারতম্য ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - জলের মধ্যে থাকা যেমন মাছের বিশেষ গুণ জলে থাকা তেমনি মরুভূমি হলো উট থাকার উপযোগী স্থান। এসো, এ বিষয়ে আমরা আরও কিছু জেনে নিই।

মাছ থাকার অনুকূল পরিবেশ জল

মাছ

এ্যাকোরিয়াম (জলাধার)

অ্যাকোরিয়াম বা জলের বোতলে থাকা মাছের গতিবিধি লক্ষ্য কর।

মাছের শরীরে তীর চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত অংশের নাম কী লেখো।

■ তুমি মাছের শরীরে কী কী দেখলে?

মাছের মুখ লক্ষ্য কর। জলে সাঁতার কাটার সময় সে তার মুখ খুলছে ও বন্ধ করছে। আমরা জানি সব প্রাণী শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা অম্লজান গ্রহণ করে। তবে বল দেখি মাছ কীভাবে অম্লজান গ্রহণ করে? মাছের কোন্ অংশ তার শ্বাসক্রিয়ায় সাহায্য করে? ....

জলে অম্লজান দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। মাছ মুখ খোলার সময় জল তার মুখ দিয়ে ঢোকে। জল থেকে এই অম্লজান আবার মাছ ফুলকা দিয়ে গ্রহণ করে শ্বাস নেয়। মাছ আমাদের মত বায়ুমন্ডল থেকে সোজাসুজি অম্লজান নিয়ে শ্বাসক্রিয়া করতে পারে না। মাছের লেজ ও ডানা, তা'র সাঁতার দিতে ও সাঁতার দেওয়ার সময় দিক্ পরিবর্তন করতে সাহায্য করে।

■ ভেবে লেখো, মাছ জল থেকে তুলে নিলে মরে যায় কেন?

■ কোন্ মাছ জল থেকে উঠে গাছে উঠে যায়। এ কথা সত্য না কি মিথ্যা, কারণ সহ লেখো।..

■ আমরা জলে ডুবে থাকলে বাঁচতে পারি না কেন? বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

অরণ্য পশুদের অনুকূল বাসস্থান ঃ

বাঘ

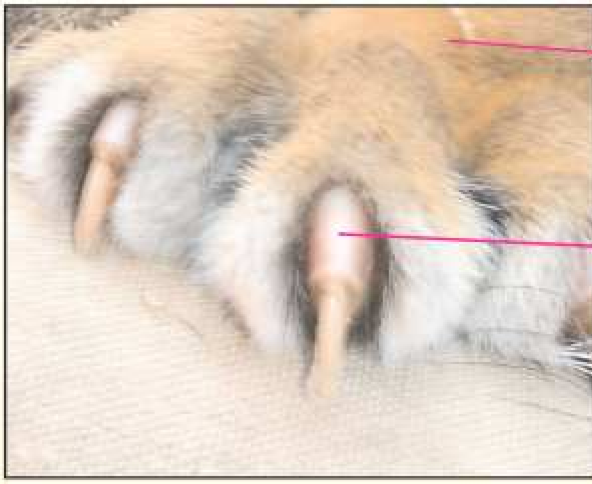

বাঘের নখ ও থাবা

বাঘ কোথায় থাকে ?

বাঘের বিশেষ গুণ হলো, তার পা বলিষ্ঠ ও শক্ত, তার পায়ের নখও খুব তীক্ষ্ম। তার সামনের দাঁতগুলিও অতি তীক্ষ্ম। পশুদের শিকার করবার সময় তার বলিষ্ঠ পা, শক্ত নখ ও তীক্ষ্ম দাঁত সাহায্য করে। এ ছাড়া বাঘের শরীরে ছোপ ছোপ দাগ থাকায় সে গাছ পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। ফলে, তার শিকার করতে সুবিধা হয়।

উট

তুমি বালির উপরে কখনও হেঁটেছ কী ? বালিতে হাঁটার সময় তুমি কী অনুভব কর ?

আমরা বালিতে হাঁটার সময় কষ্ট অনুভব করি অথচ মরুভূমিতে উট কীভাবে অত সহজেই চলাফেরা করতে পারে ? তোমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

- উটের পা চওড়া গাঁটযুক্ত, তাই তার পা বালিতে ঢোকে না।
- উটের গায়ের মোটা চামড়া মরুভূমির গরম ও ঠান্ডা থেকে তাকে রক্ষা করে।
- মরুভূমির কাঁটা জাতীয় গাছ উটের খাদ্য।
- উটের পিঠে কুজ থাকে। এতে চর্বি রূপে খাদ্য সঞ্চিত হয়। এতদ্ব্যতীত তার পাকস্থলীর কাছে থাকা থলিতে জল সঞ্চিত থাকে।
- খাদ্য ও জলের অভাব হলে তার সঞ্চিত খাদ্য ও জল ব্যবহার করে উট ৬ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

জেনে রাখা ভালো -

মরুভূমির অধিবাসীরা উটের পিঠে জিনিসপত্র নিয়ে আসা-যাওয়া করে বলে উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

উটের পা মরুভূমিতে চলার জন্য কীভাবে সাহায্য করে ?

ভেবে বলো -

খরগোশ তার কানের জন্য বহু দূরের শব্দ শুনতে পায়। এবার বলো দেখি, খরগোশ কীভাবে শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে ?

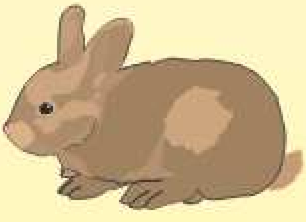

বাঁদর যে ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে ফলমূল খায় তা নিশ্চয় দেখেছো। তার পিছনের পা দুটি বেশ লম্বা হওয়ার জন্য সে ডাল থেকে ডালে সহজে লাফাতে পারে। তার প্রত্যেক পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে অন্য আঙুলগুলির ডাল সে ছুঁতে পারে। তার ফলে সে চারটি পা-কে হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে। কাজেই ডাল ধরতে ও গাছে চড়তে তার সুবিধা হয়।

বাঁদর

তোমার হাতের বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলের ডগা ছুঁতে পারছে কি না, দেখ। পায়ের বুড়ো আঙুল অন্য সব আঙুল ছুঁতে পারে কী? নিজে চেষ্টা করে দেখ।

■ এক গাছ থেকে অন্য আর একটি গাছে লাফানোর সময় বাঁদর পড়ে যায় না কেন?

____

____

ঘুড়ি উড়ছে

চড়াই উড়ছে

উড়োজাহাজ উড়ছে

আকাশে কী কী উড়তে দেখেছো?

এদের মধ্যে কোন্‌গুলি নিজে উড়তে পারে ও কোন্‌গুলি অন্যের সাহায্যে উড়তে পারে?

____

____

পাখির কি কি বিশেষ গুণ থাকায় সে আকাশে উড়তে পারে, এসো সে বিষয়ে আলোচনা করি।

- পাখিদের হাড় হাল্‌কা।
- পাখিদের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর।
- পাখিদের ডানা ও পালক উড়ার সহায়ক।
- পাখির লেজ দিক পরিবর্তনের সহায়ক।
- পাখিরা অনেক উঁচু থেকেও নিজের খাদ্য চিনতে পারে কীভাবে?

____

____

ভেবে বল, মানুষ কেন পাখির মত আকাশে উড়তে পারে না?

- তুমি কখন শীতবস্ত্র পর ও কেন পর?
- কুকুর, বিড়াল, ভাল্লুক ইত্যাদি প্রাণী পোষাক পরে না। তাহলে তারা বিনা পোষাকে কীভাবে শীত থেকে নিজেদের রক্ষা করে?

____

____

গাই

চমরী গাই

ছবি দেখে লেখো, কার শরীরে লোম বেশি? ____________________

চমরী গাই হিমালয় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। তার শরীরে প্রচুর ঘন ও লম্বা লোম থাকে। তেমনি তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রাণীদের শরীরে প্রচুর ঘন ও লম্বা ধরণের লোম থাকে। তাদের চামড়ার নীচে অনেক চর্বি থাকায় অত্যধিক ঠান্ডা তারা সহ্য করতে পারে।

শিক্ষকের সঙ্গে কিংবা মা বাবাকে নিয়ে যে পুকুরে পদ্মফুল কিংবা শালুক ফুল ফুটে আছে সেই পুকুরের দিকে বেড়াতে যাও। জবা গাছের সঙ্গে শালুক বা পদ্ম গাছের তুলনা কর।

শালুক

জবা

- পদ্ম/শালুক ফুলের বোঁটা ভেঙে ও জবার ডাল ভেঙে দেখ। কী পার্থক্য দেখলে লেখো।

____

____

- দু'টি গাছের পাতার মধ্যে কী পার্থক্য দেখছো, লেখো।

____

____

- পদ্ম/শালুক ফুলের গাছ এনে একটি জল ভরা বালতির ভিতরে ডোবাতে চেষ্টা কর। কী অনুভব করছ?
- এর শিকড়গুলি অন্য উদ্ভিদের তুলনায় বিকশিত নয়, কিন্তু পাতার বোঁটাগুলি লম্বা, নরম ও ফাঁপা।
- পাতার উপরের অংশে পর্ন ছিদ্র বা স্তোম থাকে। তার ফলে পাতা বায়ুমন্ডল থেকে বায়ু গ্রহণ করতে পারে।
- পাতার উপরের অংশ মোমের মত তৈলাক্ত হওয়ার জন্য তার উপরে জল দাঁড়াতে পারে না। এবার বল তো, শালুক/পদ্ম স্থলভাগে থাকতে পারবে কি না ও কেন?

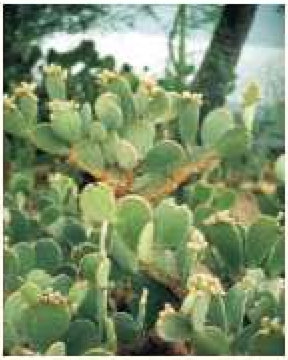

ফণি মনসা

গোলাপ

ক্যাকটাস

দু'টি চিত্রে ফুল, পত্র, কান্ড অংকন কর।

ফণিমনসার মত আর কয়েকটি কাঁটা জাতীয় গাছের নাম লেখো।

- মরুভূমিতে প্রচুর পরিমাণে কাঁটাজাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়, যথা-ফণিমনসা, ঝাউ, সিজ, নাগকেশর, ঘৃতকুমারী ইত্যাদি।
- ফণীমনসা ও সিজ জাতীয় গাছগুলির কান্ড, সবুজ, শক্ত, চওড়া ও স্থূলকায় হওয়ার দরুণ এরা জল ধরে রাখতে পারে নতুবা খাদ্য প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।
- এর পাতা থাকে না। কিন্তু কাঁটা থাকে। এই কাঁটা পাতার একটি বিশেষ রূপ, এই কাঁটা থাকাতেই গাছ পশুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে ও জল বাস্পীভূত হতে পারে না। তাই তো মরুভূমিতে প্রচুর কাঁটাজাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায় ও বেশীদিন বেঁচে থাকে।

আমরা কী শিখলাম ঃ

- পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার জন্য মাছ জলে থাকা দ্রবীভূত অম্লজান ফুলকা দ্বারা গ্রহণ করে শ্বাসক্রিয়া চালু রাখে।
- বাঘের বলিষ্ঠ পা, ধারালো নখ, বড় বড় দাঁত এবং চাকা চাকা দাগ জঙ্গলের জীবপশুদের সহজেই শিকার করতে পারে।
- উটের চওড়া পায়ের পাতা ও গাঁটযুক্ত খুর, মোটা চামড়া ও পিঠের কুঁজ, মরুভূমির জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে থাকতে সাহায্য করে।
- বাঁদর তার চারটি পা-ই হাতের মতো ব্যবহার করতে পারে। তাই তারা ডাল ধরে ধরে সহজেই গাছে চড়তে পারে।
- পাখিদের হাল্‌কা শরীর ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি আকাশে উড়তে সাহায্য করে। তাদের লেজ দিয়ে তারা দিক পরিবর্তন করতে পারে।

- চমরী গাভীর লম্বা, ঘন লোম ও চামড়ার ভিতরের চর্বি হিমালয় অঞ্চলের অত্যধিক ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে।
- পদ্মফুল ও শালুক ফুলের শিকড় ছড়ানো নয়। পাতার বোঁটা লম্বা, নরম ও ফাঁপা। পাতার উপর ভাগে অনেক ফুটো থাকে এবং হাতে তা মোমের মত তেলতেল লাগে।
- ফণীমনসা, সিজ ইত্যাদি কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদের কান্ড চওড়া, শক্ত পোক্ত ও স্থূলকায় হওয়ার জন্য বহু পরিমাণে জল জমিয়ে রাখতে পারে। এর পাতাগুলি কাঁটাতে পরিপূর্ণ থাকার ফলে পাতার মধ্যে জল জমতে পারে না কি বায়ুমন্ডলে যেতে পারে না। সেজন্য মরু অঞ্চলে বেশি কাঁটাজাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

অভ্যাস

১. সঠিক উত্তরটি বাছ।

ক) মাছের ফুলকা স্থলভাগে বাস করা প্রাণীদের কোন অঙ্গের মত কাজ করে?

১) হৃৎপিন্ড ২) ফুসফুস ৩) পাকস্থলী

খ) জলে বেঁচে থাকার জন্য কোন্‌টি সাহায্য করে?

১) ফুলকা ২) লেজ ৩) আঁস

গ) মাছ ডাঙায় এলে মরে যায়। কারণ -

১) শ্বাস নিতে পারে না ২) রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় ৩) খাদ্য খেতে পায় না।

৪) বাঁদর কোন্‌ অঙ্গের সাহায্যে ডাল থেকে ডালে সহজে লাফিয়ে যেতে পারে?

১) হাত ২) পা ৩) লেজ।

২. কারণ বল।

ক) উটকে "মরুভূমির জাহাজ" বলে বলা হয়।

খ) চিল ও শকুন উপরে উড়লেও নীচে তাদের খাদ্য সহজেই দেখতে পায়।

৩. পদ্মপাতার মত আর কোন কোন পত্র উপরে জল দাঁড়ায় না, লেখো।

---

৪. খাতায় মাছের ছবি এঁকে তার অন্য সব অঙ্গের নাম লেখো।

৫. শব্দ ধাঁধাতে বিভিন্ন পশুপক্ষীর নাম খুঁজে বের করো। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার মত প্রত্যেকের একটি করে বিশেষ গুণের পরিচয় দাও।

মা	চি	ড়
শা	ঙ্ক	ল
গা	গু	ছ

৬. যেখানে খাদ্য ও জলের অভাব সে পরিবেশেও উট কী করে অনেক দিন বেঁচে থাকে?

---

৭. চমরিগাই অত্যধিক ঠান্ডা অঞ্চলে কী ভাবে থাকে?

বাড়িতে বোসে কর ঃ

- মাছ ও ফণীমনসার ছবি এঁকে রং দাও। প্রত্যেক বিষয়ে দশ লাইন করে লেখো।
- তোমার অঞ্চলের যে কোনো ৫টি কাঁটাজাতীয় গাছের নাম লেখো।
- পদ্মপত্রের মত জলে অথবা পুকুরে ভাসমান গাছগুলির পাতা সংগ্রহ করে শুকিয়ে নাও। শুকিয়ে গেলে খাতায় সেগুলি আঠা দিয়ে চিটিয়ে দাও। তার নীচে সেই পাতার নাম লেখো ও সংগ্রহ করার তারিখ উল্লেখ কর।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ

জঙ্গল ও মৃত্তিকাক্ষয় এবং জল প্রদূষণ

আগে বাড়ির পিছনে, বাগানে, রাস্তার ধারে অনেক গাছ থাকতো। প্রত্যেক গ্রামে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের বাগান ছিল। অনেক জায়গায় ঘন জঙ্গল ছিল। তুমি কি কোথাও আম-বাগান দেখেছ?

লোকসংখ্যা বাড়ছে। লোকের আবশ্যকতা সেই অনুসারে বাড়ছে। খনিজ দ্রব্য খনন করে কারখানা তৈরি হলো। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যান্য আবশ্যকতা মেটানোর জন্য বৃহৎ জলভান্ডার তৈরি হলো। নূতন নূতন শহর গড়ে উঠলো ও রাস্তাঘাট নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রাস্তা আবার প্রশস্ত করা হলো। এজন্য জঙ্গল ও গ্রামাঞ্চল থেকে গাছ কাটা হল।

আমাদের দেশের সমুদয় ভূভাগের প্রায় শতকরা ২২ ভাগ জঙ্গল ছিল। কিন্তু এখন কমে গিয়ে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ হয়েছে। এর কারণ কী?

জঙ্গল ধ্বংস হলে বায়ুমন্ডলে কী পরিবর্তন হয়?

- জঙ্গল কমে গেলে গাছ থেকে জলীয় বাস্প বায়ুমন্ডল যথেষ্ট পরিমাণে পাবে না। ফলে বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, জলবায়ুর পরিবর্তন হবে।
- বৃষ্টিপাত আশানুরূপ হয় না।
- বেশী তাপমাত্রার ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রে মিশে যাবে। সমুদ্রের জলপতন স্তর বৃদ্ধি পাবে।
- ফসল উৎপাদন প্রভাবিত হবে। বন্যা ও খরা দেখা দেবে।
- অরণ্য নষ্ট হওয়ার কারণে বায়ুমন্ডলে অম্লজান পরিমাণ কমে যাবে ও অঙ্গারকাম্ল পরিমাণ বেড়ে যাবে।

এবার, অরণ্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় আর কি কি ক্ষতি হয় সেবিষয়ে জানবো।

যদি আমরা জঙ্গল পরিবেশের কথা বিচার করি তবে, সবুজ উদ্ভিদ জন্মালে স্বভোজীরা নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে নেয়। হরিণের মত তৃণভোজীরাও তাদের খাদ্যের জন্য জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। হরিণ বাঘের খাদ্য। হরিণ ঘাস খায়। হরিণকে বাঘ খায়। জঙ্গলে সবুজ উদ্ভিদ না জন্মালে হরিণ থাকবে না। হরিণ না থাকলে বাঘ খেতে পাবে না। ফলে বাঘের সংখ্যা কমে যাবে। অন্যপক্ষে বাঘের সংখ্যা কমে গেলে হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাবে। হরিণ সংখ্যা বেড়ে গেলে গাছের সংখ্যা কমে যাবে। আবার গাছ না থাকলে জঙ্গল তো ধ্বংস হবেই। খাদ্যকে আধার করে উদ্ভিদ থেকে মাংসাশী প্রাণী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তু মিলে মিশে থাকে। এই তাদের মহা আনন্দের জঙ্গল জীবন। সত্যিই তো বন্যেরা বনেই সুন্দর। এই সম্পর্ককে খাদ্য শৃঙ্খল বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা যদি গাছপালা কেটে জঙ্গল নষ্ট করি তবে তারা থাকবে কোথায়। একজনের অভাবেও সম্পর্ক শৃঙ্খল ভেঙে যাবে। পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে পৃথিবী থেকে অনেক জীব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অনেক প্রাণী আবার হারিয়েও গেছে। তাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণও রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হলো জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

আজকাল প্রায়ই শোনা যায় জঙ্গল থেকে হাতী নিকটবর্তী গ্রাম বা শহরে ঢুকে পড়ছে। এর কারণ কী?

জঙ্গল ধ্বংস হলে 'পরিবেশ ভারসাম্য' নষ্ট হয়ে পড়বে। জঙ্গলের গাছপালা কাটা হলে নানা প্রকার ভেষজ বৃক্ষ নষ্ট হয়ে যাবে। জঙ্গল থেকে ব্যবহার উপযোগী জঙ্গলজাত দ্রব্য ও কাঠের অভাব দেখা দেবে।

প্রাণীদের টিকিয়ে রাখার জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। তাই জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের তরফ থেকে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি এখন আলোচনা করব।

- প্রত্যেক বছর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে 'বনমহোৎসব' পালন করা হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন বনসৃজন, বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- বিদ্যালয়ে ও রাস্তার পার্শ্বে গাছ লাগানো ও পরিবেশ সুরক্ষার কাজে শিশুদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর সে কাজের জন্য বিনামূল্যে চারা বন্টন করা হচ্ছে।
- জঙ্গলে কাঠ কাটা, পশু পক্ষী শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলিতে 'ইকো' ক্লাব গঠন করা হয়েছে।
- জঙ্গল সৃষ্টি করে উদ্ভিদ ও পশুপক্ষীদের সুরক্ষার জন্য বনবিভাগ খুব চেষ্টা করছে।
- শিল্প স্থাপনের পূর্বে জঙ্গল জমি গ্রহণের জন্য পরিবেশ বিভাগের অনুমতি নেওয়ার উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।
- রাস্তা তৈরির জন্য গাছ কাটা হলে সেই সংখ্যক গাছ লাগাতে বলা হচ্ছে।
- কিছু সংখ্যক জঙ্গল সংরক্ষণের কারণে তাকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হচ্ছে।
- জঙ্গল সুরক্ষার জন্য সরকার কিছু নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে। যার ফলে গাছপালা কাটা এক দন্ডণীয় অপরাধ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

জেনে রাখা ভালো।
মাটি ধুয়ে যাওয়াকে মৃত্তিকা ক্ষয় বলে।
জলস্রোতের দ্বারা মাটি ধুয়ে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়।

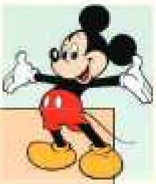

তোমার কাজঃ
একটি কাগজ উপরে কিছু শুকনো মাটি রাখ। একে জোরে ফুঁ দাও। কী দেখলে? ফুঁ দেওয়ার জন্য মাটি হাওয়ায় উড়ছে। যেখানে ঘাস আছে সেখানে যাও। সেই মাটিতে ফুঁ দাও, সে জায়গার মাটি উড়ছে কী? কেন?

তুমি এবার জানলে মাটি উপরে কোনো আবরণ না থাকলে সে জায়গার মাটি বাতাসে অন্য জায়গায় উড়ে যায়। জলস্রোত ও দূরন্ত বাতাসের ফলে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়। উদ্ভিদের শিকড় মাটিকে বেঁধে রাখে। ফলে সেই স্থানের মাটি বা মৃত্তিকা ক্ষয় হয় না।

তুমি জানো কী?

জঙ্গল ক্ষয় হলে মৃত্তিকা ক্ষয় হয়।

মৃত্তিকা ক্ষয় হলে কী ক্ষতি হয় এসো জানবো।

- গাছ বড় হওয়ার জন্য মাটি থেকে খণিজ লবণ ও আবশ্যকীয় সার গ্রহণ করে। এটি প্রধানতঃ মাটির উপরে থাকে। তা' ধুয়ে গেলে গাছ ভালোভাবে বাড়তে পারে না।
- বড় বড় গাছের গোড়া থেকে মাটি ক্ষয়ে গেলে তা সহজেই উপড়ে পড়ে।
- নদীকূলের মাটি ক্ষয় হেতু নদীতটবর্তী গ্রাম, কৃষিক্ষেত্র নদীগর্ভে তলিয়ে যায়।
- সমুদ্র ঢেউয়ের আঘাতে সমুদ্র উপকূলবর্তী জনবসতি, কৃষিক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।
- নদীগর্ভ ও মোহনা জলে বয়ে আসা মাটিতে পুঁতে যাচ্ছে। ফলে বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়ে যাচ্ছে।

- জলস্রোতে মাটি ধুয়ে ধুয়ে জলাধার ও হ্রদে মিশে গিয়ে সেগুলি ভরাট করে দিচ্ছে। হীরাকুদ জলভান্ডার ও চিলিকা হ্রদে বহু পরিমাণে মাটি জমে যাওয়ার ফলে বিপদের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।
- তোমার অঞ্চলের কোন স্থানে মৃত্তিকা ক্ষয়ে যেতে দেখেছ কী? কী কারণে সেখানের মাটি ক্ষয়ে যাচ্ছে? সেই মৃত্তিকার ক্ষতিকর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্থানীয় লোক বা সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে?
- মৃত্তিকা ক্ষয়ের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে, এসো জানবো।
- পাহাড় পর্বত ও ফাঁকা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো আবশ্যক।
- পাহাড়িয়া অঞ্চলে পয়ঃপ্রণালী দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় রোধ করা যেতে পারে।
- কৃষিক্ষেত্রের চারদিকে উঁচু করে আল দেওয়া।
- মাঠে বেশি ঘাস রাখা উচিত।
- নদীকূলে মাটি ধ্বসে যাওয়া জায়গায় পাথর বিছানো আবশ্যক।

শিক্ষকের জন্য সূচনা ঃ
কাছাকাছি মাটি ধ্বসে যাওয়া জায়গায় শিশুদের নিয়ে গিয়ে ক্ষতি ও সুরক্ষার দিকটি বুঝিয়ে দেবেন।

ব্রাহ্মণী নদী আমাদের রাজ্যের সুন্দরগড়, ঢেঙ্কানাল, যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া জেলা দিয়ে প্রবাহিত। সুন্দরগড়, অনুগুল, ঢেঙ্কানাল এবং যাজপুর জেলায় অনেক কলকারখানা রয়েছে। কারখানাগুলি তাদের ব্যবহারের জন্য ব্রাহ্মণী নদী থেকে জল নিচ্ছে কিন্তু কারখানার দূষিত জল ব্রাহ্মণী নদীতে এসে মিশছে। যার ফলে ব্রাহ্মণী নদী ও এর শাখা নদীগুলির কূলে অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ লোক ও অনেক পশুপক্ষী দূষিত জল ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে ও রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

আমাদের রাজ্যের প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জলদূষণ রোধ করার জন্য কারখানার বর্জ্য বিশোধন করে ও দূষিত জলকে দূষণ মুক্ত করে নদীতে ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে। "জাতীয় নদী সংরক্ষণ যোজনা" অনুসারে ব্রাহ্মণী নদী প্রদূষণ মুক্ত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

ব্রাহ্মণী নদীর মতো ভারতের গঙ্গানদীর জলও বিভিন্ন কারণে দূষিত হচ্ছে। এই নদীকূলে পিন্ডদান, অস্থি বিসর্জন, প্রতিমা বিসর্জন, শবদাহ ইত্যাদি কাজ নিয়মিত হচ্ছে। শহরের নোংরা জল নদীতে মিশছে। গঙ্গানদীকূলে অবস্থিত কারখানার নোংরা জলও গঙ্গার জলকে দূষিত করছে। গঙ্গানদীকে আবর্জনা মুক্ত করার জন্য ভারত সরকার ১৯৮৫ সালে '' কেন্দ্রীয় গঙ্গা কর্তৃপক্ষ'' গঠন করেছে। এই কর্তৃপক্ষ গঙ্গানদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আমরা কী শিখলাম, একবার সংক্ষেপে দেখে নিই -

- বন-জঙ্গল ক্ষয় হলে বায়ুমন্ডল বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়।
- বন-জঙ্গলকে ধ্বংস থেকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
- প্রধানতঃ জলস্রোত ও বাতাসের প্রাবল্যে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়।
- মৃত্তিকা ক্ষয় হলে চাষ ও বন-জঙ্গলের ক্ষতি হয়।
- মৃত্তিকা ক্ষয় রোধের জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। যথাঃ গাছ লাগানো, জলসেচন প্রনালীতে চাষ করা, জমিতে আল দেওয়া, পাথর বিছানো ও ঘাস লাগানো ইত্যাদি।
- নদীকূলে গড়ে উঠা কলকারাখানা ও শহরের নোংরা বর্জ্য থেকে নদীর জল দূষিত হয়।
- ব্রাহ্মণী নদীর জলকে প্রদূষণ মুক্ত করার জন্য ''জাতীয় নদী সংরক্ষণ'' আইন ব্যবহার করা হচ্ছে।
- গঙ্গানদীর জলকে প্রদূষণ মুক্ত করার জন্য '' কেন্দ্রীয় গঙ্গা কর্তৃপক্ষ'' নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

অভ্যাস

১) কারণ লেখো -

ক) জঙ্গলের জন্য বায়ুমন্ডল ঠান্ডা থাকে।

____

খ) আজকাল অনিয়মিতভাবে বৃষ্টি হচ্ছে।

____

গ) ব্রাহ্মণী নদীর জল দূষিত হচ্ছে।

____

ঘ) জঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে।

২) শূণ্যস্থান পূরণ করঃ

ক) গঙ্গানদীর জল পরিস্কার করার জন্য .... পরিকল্পনা করা হয়েছে।

খ) জঙ্গল ধ্বংস হলে বায়ুমন্ডলে .... গ্যাস বেড়ে যাবে।

গ) মাটির .... অংশ উর্বর।

ঘ) হরিণের সংখ্যা কমে গেলে .... সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৩) পার্থক্য দেখাও।

ক) জঙ্গল ক্ষয় ও মৃত্তিকা ক্ষয়।

খ) সুষম আহার ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

৪) ব্রাহ্মণী নদীর জলের প্রদূষণ অবরোধের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

৫) মৃত্তিকা ক্ষয়ের দুটি কারণ লেখো।

বাড়িতে বসে কাজ করোঃ

- তুমি বিদ্যালয়ে একটি করে গাছ লাগাও ও তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নাও।
- তোমার অঞ্চলে মৃত্তিকা ক্ষয় আটকানোর জন্য এক মডেল প্রস্তুত কর। মডেল সম্পর্কে বড়োদের সাহায্য নিয়ে এক বিবরণী প্রস্তুত করে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শক্তি ও কার্য

তুমি ব্যাটারি দ্বারা চালিত হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি বা টেবিল ঘড়ি দেখেছ। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতেও দেখেছ। এবার বল, ঘড়ির ভিতর থেকে ব্যাটারি বের করে দিলে কী হবে? ব্যাটারি অনেকদিন ব্যবহার করার পর ঘড়ির কাঁটা ঘুরবে কী? যদি না ঘুরে তবে তার কারণ কী? ব্যাটারি ভিতরে এমন কি থাকে, যা ঘড়ির কাঁটাগুলিকে ঘুরতে সাহায্য করে?

হাতঘড়ি

দেওয়াল ঘড়ি

টেবিল ঘড়ি

ব্যাটারিতে শক্তি থাকে। এই শক্তির দ্বারা কাঁটা ঘুরে। ব্যাটারিকে ঘড়ির ভিতর থেকে বের করে দিলে কাঁটাগুলি ঘোরার শক্তি পায় না। সুতরাং কাঁটাও ঘোরে না। তেমনি ব্যাটারি পুরোনো হয়ে গেলে তার শক্তি শেষ হয়ে যায়। কাঁটাগুলি না ঘুরে বন্দ হয়ে যায়। আবার নূতন ব্যাটারি দিলে সেগুলো আবার চলতে শুরু করে।

এখন তোমার কাজ ঃ ১
ঘড়ি ছাড়া অন্য কোন কোন জিনিস ব্যাটারির সাহায্যে কাজ করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

জেনে রাখা ভালো -
ব্যাটারির ভিতরের শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি বলা হয়।

তুমি অনেক সময় পর্যন্ত কিছু না খেলে তোমার ক্লান্ত লাগে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না।

তার কারণ কী?

খাবার খেলে আমরা শক্তি পাই। তারপর আমরা কাজ করতে পারি। সব প্রাণীই খাবার খায়। খাবার খেয়ে শক্তি পায়। তখন তারা বিভিন্ন প্রকার কাজ করতে সমর্থ হয়।

খাদ্যে রাসায়নিক শক্তি থাকে। খাবার খেলে এই শক্তি প্রাণীদের কাজ করার শক্তি যোগায়।

অন্য আর কোথায় রাসায়নিক শক্তি থাকে এসো জানবো। রকেট বাজিতে আগুন লাগাতে তুমি লক্ষ্য করেছ। এতে আগুন লাগিয়ে দিলে তা তীব্র গতিতে উপরে উঠে যায়। উপরে উঠার শক্তি এ কোথা থেকে পায়? বাজিতে যে বারুদ থাকে তা এক রাসায়নিক পদার্থ। এ থেকে নানান ধরণের বাজি রাসায়নিক শক্তি পায়।

বারুদে আগুন লাগালে এই শক্তি পায়। এই শক্তি নিয়ে রকেট উপরে উঠতে পারে।

রকেট বোম

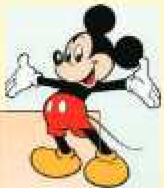

তোমাকে জল গরম করতে বলা হলো। তুমি কী করলে জল গরম হবে?

তোমার কাজঃ ২

ঘরে রান্নার কাজের জন্য কী কী জ্বালানি ব্যবহার করা হয় বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তার একটি তালিকা কর।

লন্ঠন বা লম্ফ জ্বালানোর জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ না থাকার সময় লন্ঠন বা লম্ফ জ্বেলে রাত্রে বই পড়ার অনুভূতি হয়তো তোমার আছে। কেরোসিন জ্বাললে তুমি কী অনুভব কর? জ্বালানো লন্ঠনের কাঁচে হাত দিলে গরম লাগে। কেরোসিন, গ্যাস প্রভৃতির সাহায্যে আমরা রান্নার কাজ করি। এদের জ্বালানি বা ইন্ধন বলা হয়। জ্বালানি থেকে আলো ও তাপ পাওয়া যায়।

সব ইন্ধনে রাসায়নিক শক্তি থাকে।

লণ্ঠন

লম্ফ

এই রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ ও আলোক পাই।

গ্যাস সিলিন্ডার

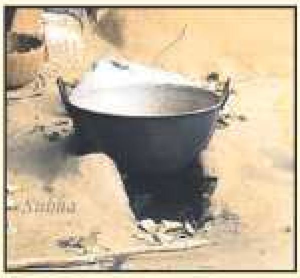
কাঠের উনুন

কয়লার উনুন

স্টোভ

স্কুটার, মোটর সাইকেল, জল তোলার পাম্প, ছোটো গাড়ি প্রভৃতি পেট্রোলে চলে। ডিজেলে চলে বাস, কার, ট্রেন, ট্রাক প্রভৃতি। পেট্রোল ও ডিজেলও এক একটি ইন্ধন। এতেও রাসায়নিক শক্তি থাকে।

পেট্রোল, ডিজেল, কয়লা, কাঠ, কেরোসিন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও ব্যাটারীতে রাসায়নিক শক্তি রয়েছে। খাদ্য থেকেও আমরা শক্তি পাই। এগুলি রাসায়নিক শক্তির উৎস।

বর্ষাকালে জল বয়ে যেতে তুমি দেখেছো। সেই জলে অনেক কিছু ভেসে যেতে তুমি দেখেছ।
বলো তো, এগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কে?

জলস্রোতে এক শক্তি থাকে। তা কিছু জিনিস ভাসিয়ে নেয়।

বর্ষার জল

জলস্রোতের শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি বলা হয়।

তোমার কাজ ঃ ৩

টেবিলের উপরে কিছু টুকরো টুকরো কাগজ রাখো। এতে ফুঁ দাও। কী দেখলে? টুকরো কাগজগুলো টেবিল থেকে নীচে পড়ে গেছে। বাতাসে এক শক্তি আছে। যা দ্রব্য সামগ্রী উড়িয়ে নিতে পারে। তবে জোরে বাতাস বইলে কী হবে?

টেবিল উপরে কাগজ টুকরো

প্রবল ঝড়ঝাপটার সময় তুমি দেখেছ গাছের ডালপালা, চালাঘরের ছাউনি, অ্যাসবেষ্টস ইত্যাদি উড়ে যায়।

ঘূর্ণিঝড়

ঝোড়ো হাওয়াতে যে শক্তি থাকে তাকে যান্ত্রিক শক্তি বলা হয়।

ভাত রান্নার সময় ভাতের হাঁড়ির উপরে ঢাকা দেওয়া ঢাকনা নিশ্চয় দেখেছ। ঢাকনাটি উপরে উঠতেও দেখেছ। বলো তো, এমন কেন হয়?

জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে। বাষ্পস্রোতে ধাক্কা খেয়ে ঢাকনাটি উপরে উঠে।

ভাত রান্না

বাষ্পতে এক শক্তি থাকে। একে বলে যান্ত্রিক শক্তি।

জলস্রোত, বাতাস ও বাষ্পে যান্ত্রিক শক্তি থাকে।
এদের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য সাধিত হয়।

জলস্রোত, বাতাসের বেগ ও বাষ্পস্রোত যান্ত্রিক শক্তির উৎস।

তোমার কাজঃ ৪
সোলা ও তালপত্র দিয়ে একটি চরকি তৈরি কর।

ক) চরকির ব্লেড উপরে একটি সরু মুখের পাইপ থেকে / সরুমুখের বোতল থেকে আস্তে আস্তে জল ঢালো। চরকিটি ঘুরবে। বলো চরকিটি ঘুরলো কেন?

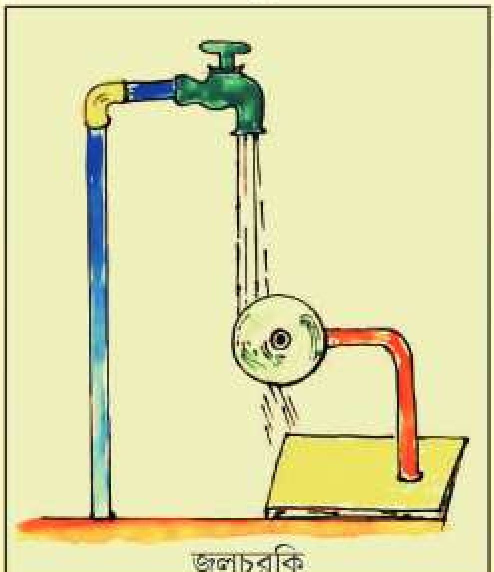
জলচরকি

খ) একটি কেটলিতে অল্প জল নিয়ে গরম কর। ঢাকনি লাগিয়ে রাখো। কেটলির নলের মুখে একটি খালি ডটপেনের রিফিল আঠালো মাটির সাহায্যে লাগিয়ে দাও। রিফিলের রাস্তা দিয়ে জলীয় বাষ্প বেরুবে। সেই বাষ্পবেগের সামনে তোমার তৈরি করা চরকিটি রাখো। দেখো, চরকিটি ঘুরছে। আচ্ছা এবার বলো চরকিটি কার সাহায্যে ঘুরলো?

গ) তালপাতা বা কাগজের একটি চরকি তৈরি করো। এর মাঝে একটি নারকেল কাঠি ঢুকিয়ে সেটি ধরে দৌড়াও কিংবা যেখানে হাওয়া দিচ্ছে সেখানে দেখাও। দেখবে চরকিটি ঘুরছে। চরকিটি ঘুরলো কেন?

প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি দেখলে চরকিটি ঘুরছে।
চরকিটি আসলে জল, বাতাস ও বাষ্পের সাহায্যে ঘুরছে।

হীরাকুদ, রেঙ্গালি, মাছকুন্দে জলের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

হীরাকুদ জলভাণ্ডার

তালচের, ঝাড়সুগুড়া প্রভৃতি স্থানে বড় বড় টাঙ্কিতে জল থেকে বাষ্প করা হচ্ছে। এই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

আমাদের দেশে সমুদ্রকূলে কয়েকটি চরকি লাগানো হয়েছে। সেটি বাতাসের দ্বারা ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও জোয়ার ও ভাটার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

সমুদ্রকূলে চরকি

জল, বাষ্প, বাতাস, জোয়ার ভাটা ইত্যাদি শক্তির এক একটি উৎস।

আর কী কী উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়?

তোমার কাজ ঃ ৫

একটি শুকনো কাগজ নাও। একটি আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মিকে সেই কাগজের উপরে ফেলো। দেখ সূর্যরশ্মি যেন সেই কাগজ উপরে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। কিছুক্ষণ পরে কী হচ্ছে বল।

কাগজের যে জায়গাটিতে সূর্যরশ্মি পড়লো সেই জায়গার কাগজটি পুড়লো কেন?

আতস কাঁচের মাধ্যমে সূর্যরশ্মি

রোদে দাঁড়ালে গরম লাগে। কোন এক বস্তুর উপরে অনেকক্ষণ ধরে সূর্যকিরণ পড়লে সেই বস্তু ছুঁলে হাতে গরম লাগে। রোদে কিছুক্ষণের জন্য জল রাখলে গরম হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় তুমি খালি পা-য়ে বালির উপরে বা পিচ দেওয়া পাকা রাস্তায় কখনও হেঁটেছ কী? কেমন লাগে?

সূর্যরশ্মি যে বস্তুর উপরে পড়ে সেই বস্তুটি কিছুক্ষণ পরে গরম হয়ে যায়। সূর্যরশ্মিতে উত্তাপ থাকে। এর থেকে আমরা জানতে পারি সূর্য থেকে তাপশক্তি পাওয়া যায়।

দিনের বেলা সূর্যের আলোয় আমাদের চারপাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বস্তুর উপরে আলো পড়লে আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। কাজেই সূর্যের আলোয় আমরা আলোক শক্তি পাই।

সূর্য আলোক ও তাপ শক্তির উৎস

আজকাল শক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য সৌরশক্তির উপরে অনেক বেশি নির্ভর করা হচ্ছে। কারণ এ হলো অফুরন্ত শক্তির উৎস। সৌরশক্তির সাহায্যে রান্নার কাজ, জল গরম করা ইত্যাদি কাজ করা যাচ্ছে। সূর্যরশ্মির শক্তিকে সৌর ব্যাটারিতে গচ্ছিত করে রাখা হচ্ছে। এর সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। শহরের চৌমাথায় যেখানে চারদিক থেকে যানবাহন চলাচল করে সেখানে সৌর ব্যাটারির সাহায্যে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এখন তো নিউক্লীয় শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে। ভারতে একে কার্যকারী করে তোলার জন্য তারাপুর ও নরোরা, কল্পকম ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে নিউক্লীয়শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

তোমার কাজ ঃ ৬
কী কী উৎস থেকে উত্তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক শক্তি পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা কর। গোবর শক্তির উৎস কী ? বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

এখন তো তুমি বুঝতে পেরেছ, শক্তির সাহায্য নিয়ে কিছু কাজ করা যায়। তুমি খাবার খাচ্ছ। খাবার থেকে শক্তি পাচ্ছ, তাই কত কাজ করতে পারছো। কাজের মাধ্যমে আমরা শক্তি ব্যবহার করি। শক্তি থাকলে কাজ করার উৎসাহ বাড়বে।

আমরা কী শিখলাম ?

- কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল, তেল, জল, জোয়ার ভাটা, প্রাকৃতিক গ্যাস, জৈবিক পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি শক্তির এক একটি উৎস।
- যান্ত্রিক শক্তি, তাপ শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি, ধ্বনি শক্তি, রাসায়নিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন কাজ করা সম্ভব।
- অফুরন্ত শক্তির উৎস যথাঃ- সূর্য, বাতাস, জোয়ার ভাটা, ভূ-তাপের অধিক ব্যবহার আবশ্যক।
- কাজ করার জন্য শক্তি আবশ্যক।

অভ্যাস

১) সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

ক) তুমি তোমার ঘরে কী কী শক্তির ব্যবহার করছ?

খ) তাপশক্তির তিনটি উৎসের নাম লেখো।

গ) ইন্ধন কাকে বলে?

ঘ) প্রদীপ জ্বললে কী কী শক্তি পাওয়া যায়?

২) তোমার ঘরে বিদ্যুৎ নাই বা বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে গেছে। রাত্রে পড়াপড়ির জন্য তুমি কী কী ইন্ধন কাজে লাগাতে পারবে?

৩) আতশবাজি ফুটলে কী কী শক্তি উৎপন্ন হয়?

৪) কারণ লেখো।

ক) খাবার খেলে আমরা কাজ করতে পারি।

খ) পেট্রোল শেষ হলে মোটর সাইকেল বন্দ হয়ে যায়।

গ) বন্যার সময় ঘর দুয়ার ভেসে যায়।

ঘ) সৌরশক্তির অধিক ব্যবহার আবশ্যক।

ঙ) ঝড়ে খড়ের ছাউনি উড়ে যায়।

৫) নীচের উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তারপাশে .. চিহ্ন দাও।

ক) কয়লা এক অফুরন্ত শক্তির উৎস।

খ) সৌরশক্তি সব শক্তির মূল উৎস।

গ) শক্তি কাজ করতে প্রেরণা যোগায়।

ঘ) পুকুরের স্থির জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

৬) একটি হাওয়ায় ঘোরা চরকির ছবি আঁক।

ঘরে বসে কর ঃ

- তোমার গ্রামের লোকেরা রান্নার জন্য কী কী ইন্ধন ব্যবহার করে বড়োদের কাছে জেনে এক তালিকা কর।
- শক্তি সংরক্ষণের জন্য ৩টি স্লোগান লেখো এবং গ্রামের লোকদের বোঝানোর জন্য কী করবে লেখো।

উনবিংশ অধ্যায়

বায়ু

তোমরা গাছের পাতা নড়তে পড়তে দেখেছ। বলো দেখি, পাতা নড়ে কেন ?

তুমি তোমার নাক কিছুক্ষণের জন্য আঙুল দিয়ে বন্দ করে তার পরে খোল। দেখো, নাকের ভিতরে কি ঢুকছে ও বাইরে কি বেরচ্ছে। পাখা ঘোরালে কী হয় ?

বিদ্যুতের পাখা ঘোরালে কি হয় ? এ থেকে আমরা জানতে পারি যে আমাদের চারপাশে বাতাস আছে ও পাখা বা হাতপাখা ঘুরালে বোঝা যায় যে বাতাস বইছে।

খালি বোতলটি উলটিয়ে তার মুখ জলে ডুবাও। কী দেখছো ? বোতলে জল ঢুকছে না। এর কারণ কী ? বোতলটি একটু বাঁকা করে তার মুখ জলের উপরে একটু তুলে দিলে কী হতে পারে লক্ষ কর। দেখবে, কিছু ফোঁটা ভুড়ভুড় করে উপরে উঠছে ও বোতলে জল ঢুকছে। তা হলে বোঝা গেল যে, বোতলের ভিতরে যে বায়ু ছিল তা ফোঁটা রূপে বাইরে বেরিয়ে এলো ও তাতে জল ঢুকতে পারলো। তার মানে খালি বোতলে বায়ু ছিল। বেলুনে ফুঁ দিলে তা বড় হয়ে ফুলে উঠে। সেই ফোলানো অবস্থায় ছুঁচ ফোটালে কী হবে ? ভেবে লেখো।

____

____

বাতাস আমরা দেখতে পাই না কিন্তু বাতাস আমাদের চারপাশে আছে। একে আমরা কেবল অনুভব করতে পারি।

তোমার কাজ ঃ ১
তিনটি সমান আকারের মোমবাতি নাও। একটি টেবিল উপরে রেখে জ্বালাও। প্রথম মোমবাতিটি ছেড়ে দ্বিতীয় মোমবাতি ছোট কাঁচের গ্লাসে ও তৃতীয় মোমবাতিটি একটি বড়ো কাঁচের গ্লাসে ঢেকে দাও।

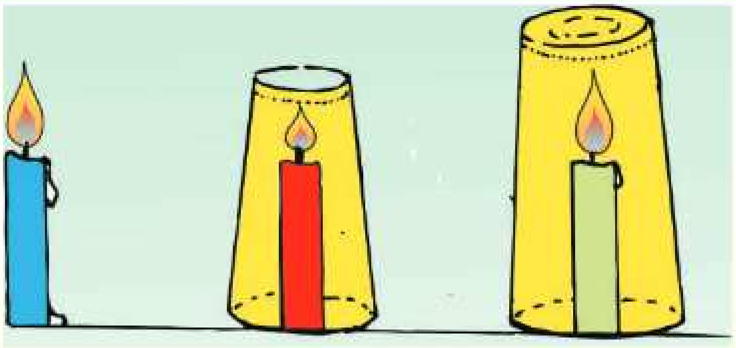

কিছুক্ষণ পরে কী দেখলে ?

প্রথমে কোন মোমবাতিটি নিভলো ?

শিক্ষকদের প্রতি পরামর্শ ঃ

শিক্ষক উপরোক্ত পরীক্ষাটি নিজে করবেন। প্রত্যেক শিশু যাতে পরীক্ষাটি ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখবেন। পরীক্ষা করারসময় শিক্ষক শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করবেন ও শিশুদের এ কাজে অংশগ্রহণ করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেবেন।

প্রথম মোমবাতিটি শেষ হওয়া পর্যন্ত জ্বললো। দ্বিতীয় মোমবাতিটি অল্প সময় জ্বলে নিভে গেল। তৃতীয় মোমবাতিটি দ্বিতীয় মোমবাতির চেয়ে বেশি সময় জ্বললো।

- প্রথম মোমবাতিটি শেষ হওয়া পর্যন্ত কেন জ্বললো ?
- বাতাসে থাকা অম্লজান জ্বলতে সাহায্য করে। প্রথম মোমবাতিটি খোলা অবস্থায় আছে। তাই সে বাতাস থেকে অম্লজান নিচ্ছে। কাজেই মোমবাতিটি শেষ হওয়া পর্যন্ত জ্বললো।
- তৃতীয় মোমবাতিটি দ্বিতীয় মোমবাতির চেয়েবেশি সময় কেন জ্বললো ? তৃতীয় গ্লাসটি দ্বিতীয় গ্লাস থেকে বড়। তাই দ্বিতীয় গ্লাসের চেয়ে বেশি পরিমাণে বাতাস তৃতীয় গ্লাসে আছে। ঐ গ্লাসে বেশি পরিমাণে অম্লজান থাকায় এটি দ্বিতীয় মোমবাতির চেয়ে বেশি সময় জ্বললো।

এর থেকে আমরা কী জানলাম ঃ

অম্লজান জ্বলতে সাহায্য করে।

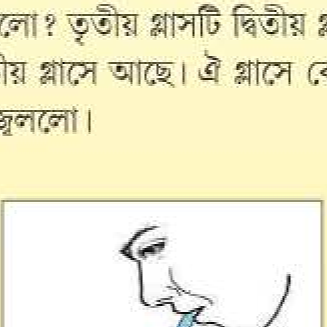

বাতাসে অম্লজান ব্যতীত আর কিছু উপাদান আছে কী ? বাতাসে থাকা অন্য উপাদানগুলি জানার জন্য এসো একটি পরীক্ষা করি।

তোমার কাজ ঃ ২

কাঁচের গ্লাসে অল্প একটু জল নিয়ে ওতে একটু চুন গুলে দাও। দেখ জল যেন স্থিরভাবে কিছুক্ষণ থাকে। (ফিলটার কাগজে ছেঁকে দিলে ভালো) গ্লাসের নীচের অংশে চুন বসে যাবে ও উপরের অংশে স্বচ্ছ চুন জল থাকবে। এই স্বচ্ছ চুন জল অন্য একটি গ্লাসে ঢেলে দাও। সেই স্বচ্ছ জলে একটি কাঁচের নল দিয়ে ফুঁক দাও। দেখ, ঐ স্বচ্ছ জলের কিছু কি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছো? স্বচ্ছ জল দুধের রঙের মতো হয়ে যাবে। এর কারণ কী?

বাতাসে থাকা গ্যাস স্বচ্ছ জলকে দুধের মতো রঙ করে দিয়েছে। এই গ্যাসকে বলা হয় - কার্বন ডাই অক্সাইড, (অঙ্গারাম্ল)

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে।

তুমি কখনো ঠান্ডা পানীয় গ্লাসে ঢেলে খেয়েছো? গ্লাসের বাইরের দিকটা লক্ষ করেছ কী? কী দেখেছো?

তোমার কাজ ঃ ৩

দু'টি সমান ধরণের শুকনো কাচের গ্লাস নাও। টেবিল উপরে রাখো। একটি গ্লাসের মধ্যে কয়েক টুকরো বরফ রাখো। এবার কী দেখছো বলো।

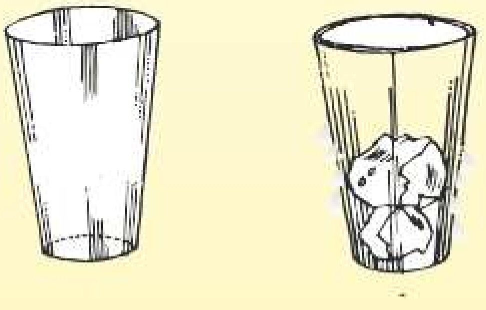

গ্লাসের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল কোথা থেকে এলো?

বাতাসের মধ্যেই অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল গ্যাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প মিশে আছে। বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে জল বিন্দুতে পরিণত হল ও বরফ রাখা গ্লাসের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে লেগে রইল।

তুমি আয়নার সামনে মুখ খোলা রাখলে মুখ থেকে ধোঁয়ার মতো কিছু ভাপ কাঁচের উপরে পড়বে। এবার কাঁচের উপরে কি লেগে থাকতে দেখলে বলো তো ? এই ছাপটা কোথা থেকে এলো ?

এর থেকে আমরা জানলাম —

বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে

তুমি বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হতে আর কোথায় দেখেছো, লেখো।

তাহলে আমরা জানলাম, বাতাসে অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প মিশে আছে। এছাড়া বাতাসে আরও অন্য উপাদানও থাকে, যথা- নাইট্রোজেন গ্যাস। এসো এবার বুঝে নিই বাতাসে নাইট্রোজেন থাকার প্রয়োজন কতটা।

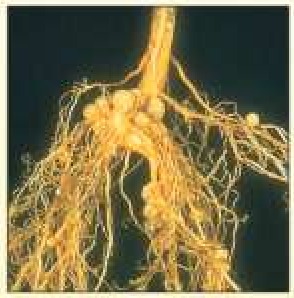

ছবিতে (মুগ, বিরি জাতীয় গাছের শিকড়) দেখানো গাছের শিকড়ে গাঁট গাঁট অংশ দেখা যাচ্ছে কেন ?

মুগ, কলাই, অড়র ইত্যাদি ডাল জাতীয় উদ্ভিদের গোড়ায় গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থিতে এক ধরণের বীজাণু থাকে। এই বীজাণুগুলি বাতাস থেকে সোজাসুজি নাইট্রোজেন গ্রহণ করে সার রূপে গ্রন্থিতে রাখে। উদ্ভিদ বা প্রাণীরা সরাসরি বাতাস থেকে এটা নিতে পারে না। তারা নাইট্রোজেনকে তাদের পোষক হিসাবে গ্রহণ করে।

তাহলে জানলে তো, অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল, যবক্ষারজান ও জলীয় বাষ্প বাতাসের মধ্যেই মিশে থাকে, যদিও আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এ ছাড়া বাতাসে অন্য কিছু উপাদান আছে কী ?

সকালে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে বারান্দায় সূর্যের আলো এসে পড়লে সূর্যের আলোতে অনেক কিছু ভাসতে দেখা যায়। বলতে পারো - এদের কী বলা হয় ?

আমরা ঘর ঝাঁট দেবার সময়/পরিস্কার করার সময় ধুলো দেখতে পাই। এতো ধুলো কোথা থেকে আসে ?

তুমি যদি অন্ধকার রাতে টর্চ জ্বালো তবে টর্চের আলোতেও এদের দেখতে পাবে। এদের বলা হয় ধুলোর কণা।

এছাড়া আর কোথাও ধুলোর কণা দেখেছো?

বাতাসে অন্যান্য গ্যাসের সঙ্গে ধুলোর কণাও মিশে আছে। আমরা খালি চোখে সেগুলো দেখতে পাই না। সূর্যের আলো বা রাত্রে গাড়ি, মোটর, টর্চ ইত্যাদির আলোতে ধূলোকণা ভাসতে দেখা যায়।

অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্পের মতো ধূলোর কণাও বাতাসে মিশে থাকে। এছাড়া উদজান, আরগন, হিলিয়ম ইত্যাদি কম পরিমাণে হলেও বাতাসের মধ্যে মিশে আছে। এগুলি বাতাসের এক একটি উপাদান। বাতাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে নাইট্রোজেন। আচ্ছা বলো তো, সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো সমান পরিমাণে থাকে? নানা কারণে ধোঁয়া, ধুলো বাতাসে মিশতে থাকে। এজন্য সব জায়গার বাতাসে এই উপাদানগুলো একই পরিমাণে থাকে না। বর্ষাকালে বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি পরিমাণে থাকে।

পাশের ছবিতে বাতাসের মধ্যে থাকা কোন উপাদান কত পরিমাণ আছে তা দেখানো হয়েছে।

বাতাসের এই উপাদানগুলি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

অম্লজান, অঙ্গারকাম্ল, যবক্ষারজানের একটি করে গুণ বিষয়ে লেখো।

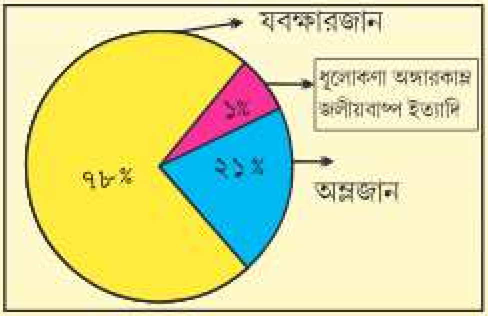

বাতাসে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ

অম্লজান ______

অঙ্গারকাম্ল ______

যবক্ষারজান ______

অম্লজানের ব্যবহার

তুমি কখনও ডাক্তারখানা গিয়ে সেখানে কোনও রোগীর নাকে কিংবা মুখে পাইপ লেগে থাকতে দেখেছো ?

এই পাইপ কেন লাগানো থাকে ?
ভেবে লেখো।

____

____

____

রোগীর নাকে পাইপ

এমন কিছু রোগী আছে যারা অনেক সময় স্বাভাবিক ভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না। অক্সিজেনের সিলিন্ডার থেকে ওরা পাইপ দিয়ে অক্সিজেন নিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস নেয়।

এর থেকে আমরা জানতে পারি -

প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলেরই শ্বাসক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন কাজে লাগে।

ডুবরি, পর্বতারোহী, মহাকাশযাত্রীরা শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার জন্য অক্সিজেন গ্যাসের সিলিন্ডার সঙ্গে নিয়ে যায়।

পর্বতারোহী

জেনে রাখা ভালো

ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ কি.মি. পর্যন্ত ভারী স্তরের বাতাস আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকে। পৃথিবী থেকে আমরা যতো উঠবো বাতাস তত কমে যায়। শ্বাস নিতে কষ্ঠ হয়।

শ্বাস নিতে অক্সিজেন যেমন আমাদের কাজে লাগে। তেমনি জ্বালানিতেও সাহায্য করে। অক্সিজেন ভরতি সিলিন্ডার সাহায্যে লোহাকাটা, ঢালাই কাজ করা যায়।

আগুন নেভানোর যন্ত্র

কার্বন ডাই অক্সাইডের ব্যবহার

তুমি বড় বড় কর্মশালা বা সিনেমা হল গিয়েছ। সেখানে দেওয়ালে লাল রঙের যন্ত্র লাগানো থাকে। এই যন্ত্রটির নাম ও তা কেন লাগানো থাকে - বোলতে পারো?

____

____

বড় বড় ঘর, কার্যক্ষেত্র, সিনেমা হল, বৃহৎ অট্টালিকা, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থানে আগুন নেভানোর যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। যদি কোনও কারণে আগুন লেগে যায়, যন্ত্র থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে আগুন নেভানো হয়। এই যন্ত্র সহজে চোখে পড়ার জন্য লাল রঙ দেওয়া হয়। অঙ্গারকাম্ল বা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

তুমি সোডাবোতল কিংবা ঠান্ডা পানীয় বোতলের ছিপি খোলার সময় কী দেখ?

____

সোডা বোতলে সোডার সঙ্গে অঙ্গারাম্ল গ্যাস মিশে থাকে। এজন্য বোতলের ছিপি খোলামাত্র এই গ্যাস ভুড়ভুড় শব্দে বাইরে বেরিয়ে আসে।

সবুজ গাছপালা খাদ্য তৈরির জন্যও বাতাস থেকে অঙ্গারকাম্ল বা কার্বন ডাই অক্সাইড টেনে নিয়ে কাজে লাগায়। খাবার তৈরিতে সূর্যালোকের সাহায্যও সে নেয়।

দেওয়ালে চুনজল লেপে দিলে কিছু সময় পরে তা কেমন দেখতে লাগে?

দেওয়ালে চুনের জল লেপে দিলে অঙ্গারকাম্ল বা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তাকে সাদা করে দেয়। সেজন্য দেওয়াল দেখতে সুন্দর লাগে।

নাইট্রোজেন/যবক্ষারজান

বাতাসের মধ্যে নাইট্রোজেন গ্যাস সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে। কিন্তু এই গ্যাস উদ্ভিদ কিংবা প্রাণী সরাসরি এটা নিতে পারে না। কেবল ডালি জাতীয় গাছের শিকড় এই গ্যাস গ্রহণ করে সার প্রস্তুত করে। বিদ্যুৎ, মেঘ গর্জন ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা যখন ঘটে তখন নাইট্রোজেন অক্সাইড সৃষ্টি হয়। এটা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে গিয়ে মিশে যায়।

কিছু কিছু কারখানায় বাতাস থেকে নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান সংগ্রহ করে তাকে সার প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। সারে পরিণত করার কাজ করে। এই সার চাষী কৃষি জমিতে প্রয়োগ করে বেশি পরিমাণে ফসল তোলে।

আমরা কী জানতে পারলাম?

- আমাদের চারপাশে বাতাস ঘিরে রয়েছে। একে আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু অনুভব করতে পারি।
- বাতাসে, অক্সিজেন(অম্লজান), নাইট্রোজেন(যবক্ষারজান), কার্বন ডাই অক্সাইড (অঙ্গারকাম্ল), জলীয় বাস্প রয়েছে। এছাড়াও বাতাসে আরও অন্যান্য উপাদান আছে। যেমন ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি। এগুলো বাতাসের অবাঞ্ছিত উপাদান। বাতাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে নাইট্রোজেন (যবক্ষারজান)। (শতকরা ৭৮)
- অক্সিজেন গ্যাস শ্বাস নিতে ও জ্বলতে সাহায্য করে।
- আগুন নেভানো, ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুত করা ও সবুজ গাছপালার খাবার তৈরি করতে কার্বন ডাই অক্সাইড (অঙ্গারকাম্ল) গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

অভ্যাস

১) বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূণ্যস্থান পূরণ কর।

ক) সমুদ্র ডুবরীরা সঙ্গে .... থলি নিয়ে সমুদ্রের গভীরে যায়। (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড)

খ) বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা .... (৩১, ২১, ৪১)।

গ) কাঠ জ্বললে তা থেকে .... গ্যাস বেরোয়। (অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন)

ঘ) কাঠ জ্বালানোতে বাতাসের .... গ্যাস সহায়ক হয়। (কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন)।

২) অক্সিজেন যে সব কাজে লাগে তার মধ্যে দুটি কাজের নাম লেখো।

____

____

৩) জেনে বলো।

ক) ঘরের জানলা, দরজা বন্ধ করে অনেক লোক বেশি সময় থাকলে অস্বস্তি লাগে কেন?

খ) বর্ষাকালে ভিজে জামাকাপড় তাড়াতাড়ি শুকোয় না কেন?

গ) ফুটবলকে সহজে চাপা যায় না কেন?

৪) বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড না থাকলে কী হবে?

____

৫) ছবি এঁকে বাতাসে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কতটা থাকে দেখাও।

____

৬) ''বাতাস স্থান অধিকার করে'' এ কথা জানার জন্য তুমি পরীক্ষা কর।

____

৭) একটি গ্লাসের ছবি আঁক। তাতে বাতাস কত পর্যন্ত আছে দাগ টেনে দেখাও।

____

৮) গাছপালা কি বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে? বুঝিয়ে লেখো।

৯) কয়লাখনি অঞ্চল, বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানার মধ্যে কোন জায়গায় বেশি ধুলোর কণা দেখতে পাওয়া যায় ও কেন?

ঘরে বসে কর ঃ

- একটা মোটা কাগজ নাও। একে চারটি টুকরো কর।
- প্রত্যেকটি টুকরো সাদা সূতি কাপড় কিংবা কাগজ দিয়ে আঠার সাহায্যে জুড়ে দাও।
- কাপড় কিংবা কাগজ উপরে ভেসলিন বা রেড়ীর তেল লাগিয়ে দাও।
- এই কার্ডগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঝুলাও।

  — একটি পরিস্কার জায়গায়

  — একটি ধূলিপূর্ণ জায়গায়

  — অন্য যে কোনও দুটি জায়গায়
- কিছুদিন পরে কার্ডগুলির মধ্যে তুলনা কর। কার্ডগুলির মধ্যে কী আছে দেখছ লেখো।
- বন্ধুদের কার্ডগুলিও দেখ। কেমন দেখতে হয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা কর।

বিংশ অধ্যায়

বায়ু প্রদূষণ

রাস্তায় ভীড়ের সময় ট্রাফিক স্ট্যান্ডে মাঝে মাঝে গাড়ি মোটর অনেক সময় দাঁড়িয়ে পড়ে। বাস ট্যাক্সি আটকে থাকার সময় প্রায়ই গাড়ির ড্রাইভার স্টার্ট বন্ধ করে না। যার ফলে কিছু গাড়ির ইঞ্জিনের ধোঁয়া মুখে বা নাকে ঢুকে যায়। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অশ্বস্তি লাগে। এই প্রকার অশ্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন তুমিও নিশ্চয় হয়েছ।

দীপাবলিতে বাজি ফুটে। আতস বাজির ধোঁয়া চোখে ঢুকলে চোখ জ্বালা জ্বালা করে। এমন কেন হয়?

যে বাতাসে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে অশ্বস্তি হয়, চোখ জ্বালা করে ও আমাদের শরীর খারাপ হয়, সেই বাতাসকে প্রদূষিত বায়ু/বাতাস বলা হয়।

বাতাসের দুটি প্রধান উপাদান — অম্লজান ও যবক্ষারজান ব্যতীত অন্য উপাদানগুলি যথা - অঙ্গারকাম্ল কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, যবক্ষারজান অক্সাইড, ধূলিকণা, জীবানু ও অন্যান্য ভাসমান পদার্থের মধ্যে যে কোনও একটির পরিমাণ বাড়লে তা আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এগুলিকে বায়ু প্রদূষন বলা হয়। বায়ু প্রদূষিত হওয়ার কারণঃ

- কলকারখানার চিমনী থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, তার সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস মিশে থাকে। এই ধোঁয়া বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে।
- মোটর গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন থেকে বেরোনো ধোঁয়া বাতাসে মিশে যায়। এই ধোঁয়াতে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে কার্বন মনো অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাসও থাকে যা বাতাসকে বেশি পরিমাণে দূষিত করে।
- যানবাহন চলাচলের সময় রাস্তার ধূলো উড়ে বাতাসে মিশে যায়। সুতরাং শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাতাসে ধূলোকণার পরিমাণ বেশি থাকে। এর ফলে অধিকাংশ শহর ও শিল্পাঞ্চলের বাতাস দূষিত হয়।
- সিমেন্ট কারখানার গুঁড়ো, অ্যাজবেস্টস কারখানার গুঁড়ো, কাপড়ের কল থেকে উড়ে আসা তুলো, চামড়া কারখানা ও কিছু সার কারখানাথেকে বেরোনো গুঁড়ো বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে।
- পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ বাতাসে মিশে বাতাসকে দূষিত করে।

আর কী কী কারণে বায়ু দূষিত হয়, বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

____

জেনে রাখা ভালো।

রেফ্রিজারেটর ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র থেকে বেরনো ক্লোরো ফ্লোরোকার্বন গ্যাসও বায়ুকে দূষিত করে।

কাঠ ও শুকনো পাতা জ্বালাতে বারণ করা হয় কেন?

____

সর্বসাধারণ স্থানে সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি খেতে নিষেধ করা হয়েছে কেন?

____

বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড (অঙ্গারাম্ল) গ্যাসের পরিমাণ কিভাবে বাড়ে?

____

বাতাসে সালফার ডাই অক্সাইড পরিমাণ বৃদ্ধি
→ পেট্রোল, ডিজেল ব্যবহৃত গাড়ি থেকে বেরনো ধোঁয়া
→ বাজি পোড়ানোর সময় বেরনো ধোঁয়া

ডাক্তারখানায় রোগীর থুতু, কফ প্রভৃতি মাটিতে পুতে দেওয়া হয় কেন?

____

এগুলো না পুতলে এদের ভিতরে থাকা জীবাণু বাতাসে মিশে বাতাস দূষিত করে। বায়ু দূষিত হলে নানা রকমের অসুখ হয়। আমরা জানি ধোঁয়া ও ধূলো আমাদের চোখে ঢুকলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। চোখ করকর করে ও লাল হয়ে যায়। ধোঁয়া বা ধূলো শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরের ভেতরে ঢুকলে শরীর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

জেনে রাখা ভালো।
প্রত্যেক বছর আমরা জুন মাসের ৫ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করি। পরিবেশ দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো ও পরিবেশের সমানুপাত বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার কাজ করা হচ্ছে।

কী কী ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা বায়ু দূষণের প্রতিকার সম্ভব?

____

যানবাহন চলাচলের ফলে যে বায়ু প্রদূষিত হয় তা প্রতিকারের জন্য সরকারের তরফে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রদূষণ প্রতিরোধের জন্য গাড়ির চালকদের মাঝে মাঝে গাড়ির প্রদূষণ স্তর পরীক্ষা করা আবশ্যক। যে গাড়ি বায়ুমন্ডলে কম বিষাক্ত গ্যাস ছড়ায়, সেই গাড়িকে ''প্রদূষণ মুক্ত গাড়ি'' বলে চিহ্নিত করণের স্টিকার দেওয়া হচ্ছে। দিল্লী, মুম্বইয়ের মত বড় বড় শহরে প্রদূষণ মুক্ত (কম্প্রেসড্ ন্যাচারল গ্যাস - সি.এন.জি চালিত) বাস চলাচল করছে।

যে যে কারণে বায়ুমন্ডল প্রদূষিত হচ্ছে, সেই কারণগুলি দূর করতে পারলে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

- কাঠ, শুকনো পাতা গোবরের ঘুঁটে জ্বালানোর পরিবর্তে ধোঁয়াহীন জ্বালানি ও উনুন ব্যবহার করতে হবে।
- আবর্জনা না পুড়িয়ে মাটিতে পুতে দিতে হবে।
- কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস বায়ুমন্ডলকে দূষিত করে। এই দূষিত গ্যাসের ফলে পরিবেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য দূষণ এড়াতে কলকারখানার মালিকদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।
- ডাক্তারখানার অব্যবহার্য আবর্জনা পুতে দিতে হবে।
- গাড়ি মোটরের গ্যাস নিঃসৃত পাইপে দূষণ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- পারমাণবিক পরীক্ষা থেকে নির্গত বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
- প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো উচিত। বনাঞ্চল বিনাশ সাধনের পরিবর্তে বিকাশ সাধনের জন্য কার্যকারী সার্বিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

- শহরাঞ্চল ও কলকারখানার রাশীকৃত বর্জ্য পদার্থ ও গ্যাস নিঃসরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ঘন জনবসতি অঞ্চলে কল কারখানা স্থাপন না করা।

আমরা কী শিখলাম ?

- যে বায়ু স্বাস্থ্য পক্ষে ক্ষতিকারক তাকে দূষিত বায়ু বলা হয়।
- বায়ু বিভিন্ন কারণে দূষিত হয়।
- বায়ু প্রদূষণ এড়ানোর জন্য প্রচুর গাছ লাগানো দরকার। এছাড়া নোংরা বর্জ্য পদার্থ মাটিতে পুতে দেওয়া, কাঠ, শুকনো পাতা জ্বালানো বন্দ করা, প্রদূষণ মুক্ত গাড়ি মোটর চালানো ইত্যাদি পন্থা হাতে নেওয়া আবশ্যক।

অভ্যাস

১) বায়ু প্রদূষিত না হওয়ার জন্য আমরা যা করবো সেই উক্তির পাশে '✓' চিহ্ন ও যা করবো না সেই উক্তির পাশে '✗' চিহ্ন দাও।

ক) রান্না ঘরে চিমনী লাগাবো।

খ) সন্ধ্যার সময় ঘরে ধুনা দেব।

গ) হাঁচি কাশির সময় মুখে রুমাল দেব।

ঘ) ঘরের চারপাশে গাছ লাগাবো।

ঙ) পচাদুর্গন্ধ যুক্ত খাদ্য ও ঘরের নোংরা যেখানে সেখানে ফেলবো।

চ) দীপাবলি উৎসবে অনেক বাজি ফাটাবো।

ছ) বিদ্যালয়ের স্তূপীকৃত নোংরা মাটিতে পুঁতে দেব।

জ) শীতের রাতে কাঠ, খড়কুটা, শুকনো পাতা জ্বেলে তার চারপাশে বসবো।

ঝ) সিগারেট, বিড়ি না খাওয়ার জন্য অন্যদের অনুরোধ করবো।

২) **বন্ধনী থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে শূণ্যস্থান পূরণ করো।**

ক) জঙ্গল ধ্বংস হলে বায়ুমন্ডলের .... পরিমাণ বেড়ে যায়।
(অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, জলীয় বাস্প)

খ) গাড়ি মোটর যাতায়াতের সময় ধূলো উড়লে বায়ুমমন্ডলে .... পরিমাণ বেড়ে যায়।
(জলীয় বাস্প, অক্সিজেন, ধূলোর কণা, নাইট্রোজেন)

গ) বায়ু প্রদূষণ এড়ানোর জন্য .... করবো।
(বৃক্ষরোপণ, অট্টালিকা নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন)

৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বায়ু দূষিত হয়। এই উক্তিটি ঠিক না ভুল ? কারণ সহ লেখো।

৪) জনাকীর্ণ অঞ্চলে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না কেন ?

৫) শহরাঞ্চলে বহু সংখ্যক গাছপালা লাগানো হয় কেন ?

৬) বায়ু দূষিত হওয়ার তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করো।

৭) বায়ু প্রদূষণ প্রতিরোধের ৩টি উপায় লেখো।

ঘরে বসে করো

- মোটা কাগজে কলকারখানা দ্বারা বায়ু দূষিত না হওয়ার এক মডেল প্রস্তুত কর। মডেল সম্পর্কে এক বিবরণী প্রস্তুত কর। শ্রেণীকক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করো।
- বায়ু দূষণ কমাতে জঙ্গল সাহায্য করে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, খবর কাগজে এই সম্পর্কীয় লেখাগুলি সংগ্রহ কর। ওইগুলি খাতাতে আঠা দিয়ে লাগাও।

একবিংশ অধ্যায়

আমাদের জীবনে বিজ্ঞান

হাজার বছর আগে মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করতো। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ ও পশুপক্ষী শিকার করে খেতো। গাছের বল্কল পরতো। তখন তার জীবনযাত্রা অনেক সরল ছিল। আবশ্যকতা ছিল সীমিত। ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনযাত্রা প্রণালীতে পরিবর্তন এলো। কাজেই বিভিন্ন প্রকার জিনিসের আবশ্যকতা অনুভব করল। চাহিদা মেটাতে চাইলো। ধীরে ধীরে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মতো উন্নত মানের জিনিস প্রস্তুত করতে শিখলো। নানা ধরণের নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করলো। পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রাতেও পরিবর্তন এলো। আজ তো মানুষ সব বিষয়ে চরম উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছে ও অভূতপূর্ব জিনিস তৈরি করছে। মানুষের আবিষ্কৃত কয়েকটি জিনিসের ছবি নীচে দেওয়া হলো। মানুষ এগুলি ব্যবহার করে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারছে। এ কেবল বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যই সম্ভব হয়েছে।

নৌকা

টিভি

জলজাহাজ

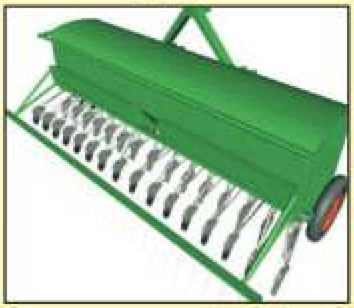
ধানবুনা যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

লণ্ঠন

রেডিও

টেলিফোন

ওষুধ (ক্যাপসুল)

কমপিউটার

সাইকেল

লাঙ্গল

বাস

ওপরের ছবিগুলি দেখ, কোন কোন কাজে সেগুলো আমরা ব্যবহার করি নীচের সারণীতে লেখো।

যোগাযোগ	টেলিফোন, দুরদর্শন, রেডিও
গমনাগমন	
কৃষি	
চিকিৎসা বিজ্ঞান	

আজকাল পঠন পাঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়। আজ থেকে অনেক বছর আগে এ-সব সুবিধা ছিল না। সে যুগের মানুষ মাটির উপরে লিখে মুছে ফেলতো। পরে পাথরে, তালপাতায় লিখতে শুরু করলো। ক্রমে ক্রমে মানুষ কালিতে কলম ডুবিয়ে ও তারও পরে কলমে কালি ভরে লিখতে লাগলো। এখন তোমরা ডট্পেনে লিখছো - তাতে কালি ভরার প্রয়োজন হয় না।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ওয়াটারম্যান ঝর কলমের আবিষ্কার কর্তা। 'বলপেন' আবিষ্কার করেন আমেরিকার জন লাউভ, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

তুমি আর অন্য কোথায় পাথরে লেখা থাকতে দেখেছো?

___

___

কাগজ ও কলমের আবিষ্কারের পরে লেখাপড়া অনেক সহজ হলো। ছাপাখানার সাহায্যে প্রথমে চটি বই ও পরে বড়ো বড়ো বই ছাপা হতে লাগলো। এখন কমপিউটার ও অফসেট মেসিনের সাহায্যে কম সময়ে ও সহজে ছাপাই কাজ হতে পারছে।

তুমি ও তোমার বন্ধুরা বাড়ি থেকে স্কুলে কিভাবে আসছো?

___

তুমি কি কখনও তোমার গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম বা শহরে গিয়েছ? কিসে করে গিয়েছ?

___

পূর্বকালে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হলে পায়ে হেঁটে, গোরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, গাধা, উট, পাল্কী কিংবা নৌকাতে যেতো। এজন্য অনেক সময় লাগতো।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডের ম্যাকমিলন সাইকেল আবিষ্কার করেছিলেন। আমেরিকার উইলবর রাইট্ ও অরভিল রাইট্ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন।

আজকাল সাইকেল থেকে আরম্ভ করে উড়োজাহাজ পর্যন্ত অনেক প্রকার যানের সাহায্যে মানুষ খুব কম সময়ে দূরদূরান্তর পর্যন্ত সহজে পৌঁছে যেতে পারছে।

মহাকাশযানের সাহায্যে মানুষ ভূপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহে পাড়ি দিচ্ছে। নদী বা সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদি যানের ব্যবস্থাও রয়েছে। বাস, ট্রেন, বিমান ও জাহাজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অল্প সময়ে যাতায়াত করছে।

তোমার কাকা কিংবা মাসী বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও তুমি তার খবর পাও কীভাবে?

আজকাল দেশ বিদেশের ঘটনাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারো কীভাবে?

যোগাযোগ ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে বিজ্ঞান আমাদের বিশাল পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনও স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনার খবর আমরা সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাচ্ছি ও দেখতেও পাচ্ছি। কিন্তু আগে আমাদের যোগাযোগের জন্য ডাকবিভাগের উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হতো।

আজকাল ডাকবিভাগ অপেক্ষা দূরসঞ্চার বিভাগ উপরে আমরা বেশি নির্ভর করি। টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট মাধ্যমে আমরা যে কোনও সময় পৃথিবীর যে কোনও স্থানে বসবাস করা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি। আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লোকের সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফটোও দেখতে পারছি।

বিজ্ঞানের সাহায্যে যোগাযোগ ক্ষেত্রে কী কী অগ্রগতি ঘটেছে?

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের চার্লস বাবেজ কমপিউটার, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার আলেকজান্ডার গ্রাহম বেল্ টেলিফোন ও ১৮৯৪ -এ ইটালীর মার্কোণী রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন। আমেরিকায় প্রথম ইন্টারনেটের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।

- খবর কাগজ পড়ে আমরা দেশ বিদেশের খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পেয়ে যাই।
- রেডিওর মাধ্যমে দেশ বিদেশের খবর জানতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার মনোরঞ্জন কার্যক্রম যথা - গান, নাটক ইত্যাদি শুনতে পাই এবং কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপাদেয় সূচনাগুলিও জানতে পারি।
- টি.ভি. মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানের সংবাদ জানতে পারি। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্যক্রম দেখতে পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন যে সব ঘটনা ঘটে তার সোজাসুজি প্রসারণ আমরা ঘরে বসে টি.ভি.-র মাধ্যমে দেখতে পাই।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, আবহাওয়া, রেলসেবা, সংবাদ পরিক্রমা, বিভিন্ন অঞ্চলের কাজ, ব্যাঙ্ক সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজগুলি কমপিউটার দ্বারা খুব কম সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।
- আজকাল ইন্টারনেটের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওড়িশার অধিকাংশ শহরে ইনটারনেটের সুবিধা রয়েছে। এর সাহায্যে অজানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা, পৃথিবীর যে কোনও সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা যাচ্ছে।

তোমার ঘরে ও বিদ্যালয়ের জিনিসগুলির মধ্যে কোনগুলি বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা চালিত?

বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে চালিত আর কি কি জিনিসের কথা তুমি জান?

শিক্ষকদের জন্য সূচনাঃ
শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কমপিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবেন।

বিদ্যুতের কাছে আমরা কি উপকার পেয়েছি?

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের যোসেফ স্বান ও আমেরিকার থোমাস্ এডিসন্ বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কার করেছিলেন। আমেরিকার জ্যাকোব পার্কিনস ১৮৩৪ -এ রেফ্রিজেরেটর যন্ত্র তৈরি করেছিলেন।

- অতীতে মানুষ রাত্রে আলোর জন্য কাঠ, মোমবাতি, লণ্ঠন প্রভৃতি ব্যবহার করতো। আজকাল বাড়ি, রাস্তা, কলকারখানা বিদ্যুতের আলোতে আলোকিত হচ্ছে।
- শাক সবজি, ফল, মাছ, মাংস ইত্যাদি অনেক দিন টাট্কা রাখার জন্য রেফ্রিজেরেটার ব্যবহার করা হচ্ছে।

- বিদ্যুৎ শক্তিতে চালিত শীততাপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র বাড়ি, অফিস, কলকারখানা ও যানবাহনগুলিতে লাগানো হচ্ছে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রীষ্মকালে ঘরবাড়ি ঠান্ডা থাকে।
- বিদ্যুতের সাহায্যে জামাকাপড় কাচা, ইস্ত্রী করা, মশলা বাঁটা ইত্যাদি ঘরের কাজ সুবিধা এবং কম সময়ের মধ্যে আমরা করতে পারছি।

বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে কী কী উন্নতি হয়েছে?

- আগে হালের সাহায্যে চাষ হতো। এখন জমিতে ট্র্যাক্টর দিয়ে ধান চাষের কাজ হচ্ছে। মাটিকে চাষের উপযুক্ত করার জন্য ট্রাকটর, ধান বোনার জন্য ধান বোনা যন্ত্র, ধান রোয়া যন্ত্র, ধান ও গম ঝাড়ার যন্ত্র, পোকা থেকে রক্ষার জন্য পোকামারা যন্ত্র ইত্যাদি যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে চাষীদের কাজের অনেক সুবিধা হচ্ছে।
- মানুষ ফলন বাড়ানোর জন্য অনেক রকম উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করতে পারছে। বেশি পরিমাণে ফসল ফলানোর জন্য রাসায়নিক সার ও পোকা মারার ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে।
- যে সব জমিতে জলের অভাব, নদী নালার অভাব, সেখানে নলকূপ খনন করে মোটর পাম্পের সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থা করায় চাষীরা উপকৃত হচ্ছে। এমন কি কুয়ো, নালা থেকে যন্ত্রের সাহায্যে জল তুলে চাষের কাজে ব্যবহার করতে পারছে।

তুমি নিশ্চয় বাড়ির কারও সঙ্গে অথবা বন্ধুর সঙ্গে ডাক্তারখানা গিয়েছ কিংবা টিভিতে ডাক্তারখানার ছবি দেখেছো। আচ্ছা বলো তো, ডাক্তারখানায় কী কী জিনিস দেখতে পাওয়া যায়?

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কী কী উন্নতি হয়েছে বড়োদের জিজ্ঞাসা করে লেখো।

বড়ি

স্টেথিসকোপ

সিরিঞ্জ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

ব্লাড প্রেসার মাপার যন্ত্র

থার্মোমিটার

ওপরের ছবিগুলি দেখো। কোন ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছো নীচে লেখো।

- আজকের দিনে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক টীকা পাওয়া যাচ্ছে।
- আমাদের শরীরের ভিতরে যে সব রোগ দানা বাঁধে (ক্যানসার, যক্ষ্মা, কিডনীর পাথর, হৃৎপিন্ডের ধমনীতে রক্ত ঠিকমত প্রবাহিত না হওয়া ইত্যাদি) তা এক্সরে, আলট্রাসাউন্ড, স্ক্যানিং ইত্যাদি পরীক্ষার সাহায্যে জানতে পারি।
- আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চোখ, হৃৎপিন্ড কিডনির প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।
- দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে শরীরের কোন অঙ্গের আকৃতি বিকৃত হলে প্লাস্টিক সার্জারির দ্বারা অনেকটা পূর্ববৎ আকৃতি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে।
- হাত বা পা কেটে গেলে কৃত্রিম হাত বা পা লাগানো হচ্ছে।
- অপারেসন ক্ষেত্রেও আগের মতো শরীর না কেটে আজকাল ল্যাপ্রোস্কোপির দ্বারা কম সময়ের মধ্যে অপারেসন করা হচ্ছে।
- লেজার রশ্মির দ্বারা চোখ অপারেসন করা হচ্ছে।
- ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর গ্যালিলিও থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন।
- নির্মাণ শিল্পে আজকাল অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে খুব কম সময়ে ও কম লোককে নিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রীজ, পাকাবাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমাদের জীবনযাপন পদ্ধতিও অনেক পাল্টে গেছে। খুব অল্প সময়ে নির্ভুলভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমরা অনেক কাজ করতে পারছি। দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রে আবার বিজ্ঞানের দানকে মানুষের কল্যাণকর কাজে প্রয়োগ না করে মানব সমাজের অহিতকর কাজে প্রয়োগ করছি।

বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ ঃ

এই বিষয়ে তোমার অভিভাবক বা বড়োদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ও ৯ অগাষ্টে জাপানের দু'টি প্রধান শহর হিরোসীমা ও নাগাসাকি উপরে পরমাণু বোমা ফেলে ধ্বংস করেছিলো। এর ফলে অনেক ধন জীবন নষ্ট হয়েছিল। বোমা বিস্ফোরণ এতো ভয়ংকর ছিল যে, অনেক বছর পরেও সেখানের লোকেরা বিকলাঙ্গ ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।
- আজকাল যুদ্ধে জৈবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জৈবিক অস্ত্র দ্বারা আন্থ্রাস রোগ নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে।
- পোকামারা ওষুধের বহুল প্রয়োগের ফলে অনেক উপকারী জীব মারা যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশের ভারসাম্য থাকছে না।
- রাসায়নিক সার উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার না করলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়।
- ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও ভিটামিন খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক।
- মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ব্রেনের উপরে কুপ্রভাব পড়তে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা যেমন উপকৃত হয়েছি তেমনি আবার বিজ্ঞানের দ্বারাই ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত জিনিসগুলি সদুদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে না পারি। তুমি বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের আর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ কর।

আমরা কী শিখলাম ঃ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যোগাযোগ, যাতায়াত, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

- টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর যে কোনও স্থানের যে কোনও লোকের সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে যোগ স্থাপন করতে পারছি।
- স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষেধক টীকা, রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যাধুনিক মেসিন ও অপারেসন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে মানুষকে অনেক কঠিন রোগ থেকে মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।
- আজকাল বাস, ট্রেন, জাহাজ ও বিমানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি অল্প সময়ে মানুষ যাতায়াত করতে পারছে।
- বিজ্ঞানের দান যেন আমরা মানুষের কল্যাণে বিনিয়োগ করতে পারি সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত।

অভ্যাস

১) ভিন্ন শব্দটি বেছে পাশের ঘরে লেখো।

ক) বাস, ট্রাক, সাইকেল, টেলিভিশন

খ) ধান বুনা যন্ত্র, বীজ, স্টেথিস্কোপ, রাসায়নিক সার

গ) কলম, রেডিও, বই, পেনসিল

ঘ) থার্মোমিটার, জেরক্স মেসিন, ব্লাডপ্রেসার যন্ত্র, সিরিঞ্জ

২) নিম্নলিখিত জিনিসগুলি কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

টিভি, বাস, মোবাইল, ট্রাকটার, বই, ইঞ্জেকশন, ব্ল্যাকবোর্ড, জলের পাম্প, উড়োজাহাজ, মাইক্রোস্কোপ, সাইকেল, ওষুধের বোতল ও কম্পিউটার।

যোগাযোগ ঃ

যাতায়াত ঃ

শিক্ষা ঃ

চিকিৎসা ঃ

কৃষি ঃ

৩) চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের কীভাবে সাহায্য করছে ?

৪) কী কী ক্ষেত্রে বিজ্ঞান দ্বারা সৃষ্ট জিনিসের অপব্যবহার হচ্ছে। উদাহরণ সহ লেখো।

৫) তোমার ভাই বাইরে পড়াশুনা করছে। তোমার বাবা তার পঠন পাঠনের জন্য টাকা পাঠাতে চান। তিনি কীভাবে সে টাকা ভাইয়ের কাছে পাঠাবেন ?

৬) বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত কোন তিনটি জিনিস তোমার অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় ? কারণ কী ?

বাড়িতে বসে কর ঃ

- যে কোও ওড়িশার খবর কাগজের সাত দিনের সংস্করণ পড়। তাতে কোন কোন বিষয়ে খবর বেরিয়েছে, তা আলাদা আলাদা করে খাতায় আঠা দিয়ে চিটিয়ে দাও। (কৃষি, শিক্ষা, খেলা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের সংবাদগুলি পৃথক পৃথক পৃষ্ঠাতে আঠা দিয়ে লাগাবে।)
- তোমার গাঁয়ের লোককে জিজ্ঞাসা করে লেখো — আগেকার অপেক্ষা আজকাল কৃষিক্ষেত্রে কী কী উন্নতি হয়েছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার

তোমরা বোধহয় জানো, আমাদের সম্পদগুলোর মধ্যে কিছু প্রাকৃতিক ও আর কিছু মানুষের তৈরি। সমগ্র উদ্ভিদজগত, প্রাণীজগত, জল, বায়ু, মাটি, খনিজ পদার্থ, পাহাড়, পর্বত, আর সূর্যের আলো প্রকৃতির প্রধান সম্পদ। জন্ম থেকেই আমরা প্রকৃতি থেকে এ সব সম্পদ পাই ও কাজে লাগাই।

মাটি, খনিজ সম্পদ, জল ও অরণ্য সম্পদ কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়, এসো তা জানবো।

জলসম্পদ ঃ

মানুষের বা জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য জল একান্ত প্রয়োজন। ভূপৃষ্ঠে এবং মাটির নীচে যে জল থাকে তার মাত্র এক শতাংশ থেকেও কম জল মানব সমাজ ব্যবহার করে। প্রধানতঃ কোন্ কোন্ কাজের জন্য জল ব্যবহার করা হয়।

জল সংরক্ষণ

জল অপচয়

জেনে রাখা ভালো -
দাঁত মাজা অথবা মুখ ধোওয়ার সময় জলের পাইপ থেকে ২ মিনিট খোলা রাখলে কম করে ৩ লিটার জল নষ্ট হয়। বলো তো দেখি, তোমার ঘরের সবাই যদি এই ভাবে জল ব্যবহার করে তবে একদিনে কত লিটার জল নষ্ট হবে? মাসে কত লিটার জল নষ্ট হবে?

সমগ্র বিশ্বে মাটির নীচে জলের স্তর অনেক দ্রুত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে। আজকাল কৃষি, শিল্প ও ঘরের কাজকর্মে অবিচারিত ভাবে মাটির নীচ থেকে জল তুলে খরচ করা হচ্ছে। ফলে তার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে অনুভূত হচ্ছে। মাটির নীচের জল নষ্ট করা উচিত নয়। যথাসম্ভব বৃষ্টির জল দিয়ে চাষবাস করা দরকার।

এই জলাভাব জনিত সমস্যা কী করে দূর করা যায়?

এই সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে বৃষ্টির জল ধরে রাখা। বর্ষাকালে ঘরের ছাদের জল বড় পাত্রে ধরে রাখা দরকার। প্রয়োজন মতো সেই জলে স্নান করা, বাগানে জল দেওয়া এমনকি বাড়ির অন্যান্য কাজও এই জল দিয়ে করা যায়। বর্ষার জল দিয়ে কাজ করা দরকার। পুকুরগুলো গভীর করে কাটা দরকার। নদীর জল, বর্ষার জল মাটির নীচে পাঠানো দরকার। তাহলে ভূতলের জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। জলের অপচয় রোধ করা দরকার।

তুমি জানো কী?
হিমাচল প্রদেশ আমাদের দেশের প্রধান রাজ্য যেখানে সরকারী এবং বেসরকারী স্তরে নির্মিত ছাদের উপরে বৃষ্টির জলে চাষ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামগুলোতে বৃষ্টির জল যথাসম্ভব পুকুর কেটে ও জলাধার তৈরি করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।
- "জল-ই-জীবন; দয়া করে এর অপচয় করবেন না" -এই প্রকার স্লোগান লিখে মানুষকে সচেতন করা দরকার। জল বাঁচানো দরকার না হলে একদিন দেখা যাবে মাটির নীচে খাবার জল আর নেই।
- জল সম্পদের আবশ্যকতা / তথা গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে বোঝাতে হবে। মাটির নীচের জলস্তর শুকিয়ে গেলে খাবার জল পাওয়া মুশকিল হবে।

বৃষ্টির জল ধরে রেখে কী কী কাজ করা যেতে পারে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো।

মৃত্তিকা সম্পদ ঃ

তুমি জান কী ?

কেঁচোরা কৃষকের বন্ধু; মাটির উর্বরতা বাড়াতে সাহায্য করে। বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের প্রভাবে মাটির ভিতরে লুকিয়ে থাকা কেঁচো আর কয়েকটি উপকারী পোকামাকড় মরে যায়। কাজেই এসব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ভেবেচিন্তে করা দরকার।

- মাটির দূষণ রোধ করা ও তার উর্বরতা বাড়ানোর জন্য সকলের যত্নবান হওয়া আবশ্যক।
- চাষের ফলন বাড়ানোর জন্য কীটনাশক সারের ব্যবহার বাড়ছে। মাটির দূষণমুক্ত ও সুরক্ষার জন্য কৃত্রিম সারের বদলেগোবর সারের ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- কীটনাশক বিষ প্রয়োগে চাষের ফলন বেশি হলেও এর ফলে মাটি নষ্ট হয়ে যায়। তাই রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার না করা উচিত।
- গ্রাম ও শহরের আবর্জনা থেকে প্লাস্টিকের মত যে সব পদার্থ পুনর্বার ব্যবহারের অযোগ্য সেগুলো নষ্ট করে দেওয়া দরকার। গোয়াল ও পোলট্রির আবর্জনাকে কম্পোষ্টে পরিণত করা উচিত।
- একই জমিতে সর্বদা একই প্রকার চাষ না করে অন্য ধরণের ফলন ফলানো আবশ্যক, তাহলে জমির উর্বরতা সমান থাকবে, হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।
- যেখানে মাটির ক্ষয় হয় সেখানে শিকড়যুক্ত গাছ লাগানোর উপরে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

জঙ্গল সম্পদ ঃ

- জঙ্গল এক মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। বনের গাছপালা সব প্রকৃতির সম্পদ। বিভিন্ন প্রকার গাছ গাছড়া ও জীবজন্তু ওগুলো নিয়েই জঙ্গল তৈরি হয়।
- জঙ্গল থেকে অযথা গাছ কাটা হবে না।

- প্রয়োজন অনুযায়ী গাছ কাটতে হলে সেই জায়গাতে নতুন করে গাছ লাগাতে হবে।
- জঙ্গল থেকে অনেক প্রকার ফলমূলও পাওয়া যায়। সেগুলো সংগ্রহ করে উপযুক্ত ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।
- জঙ্গলে অনেক প্রকার জীবজন্তু বাস করে। ওদের শিকার করা দন্ডনীয় অপরাধ - একথা সবাইকে জানানো আবশ্যক।
- জঙ্গলের জমিতে সম্ভব হলে চাষ করা যেতে পারে।
- জঙ্গলে ছাতিম, শিরীষ, শিমুল জাতীয় মূল্যবান গাছ লাগিয়ে অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা যেতে পারে।

খনিজ সম্পদ ঃ

খনি

আমরা লোহাপাথর থেকে লোহা, বক্সাইট থেকে অ্যালুমিনিয়াম বের করি। এই পাথরগুলো খনি থেকে বের করতে হয়। এদের খনিজ পদার্থ বলা হয়। এছাড়াও খনি থেকে অনেক দ্রব্য যথা- কয়লা, পেট্রোলিয়াম, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি পাওয়া যায়। এগুলি এক একটি খনিজ সম্পদ। তোমার ঘরে থাকা লোহা ও অ্যালুমিনিয়াম থেকে প্রস্তুত জিনিসগুলোর নাম লেখো। খনি থেকে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে খনিজ পদার্থ তুলে নিলে একদিন খনিজ পদার্থ শেষ হয়ে যাবে। পরিণাম চিন্তা করে আবশ্যক মতো খনিজ পদার্থ, খনি থেকে তোলা হয়।

জেনে রাখা ভালো

ওড়িশা খনিজ সম্পদের এক ভাঁড়ার ঘর। সারা দেশে গচ্ছিত খনিজ পদার্থের প্রায় ১৬.৮ প্রতিশত আমাদের রাজ্য থেকেই পাওয়া যায়।

লক্ষ লক্ষ বছর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মাটির নীচে গাছপালা পুতে যাওয়ার দরুণ অম্লজানের অভাবে ভূপৃষ্ঠের চাপ ও আভ্যন্তরীণ তাপে সেগুলো কয়লাতে পরিণত হয়।

কয়লা আমাদের কী কী কাজে লাগে?

____

____

তোমরা জানো, কয়লা বিভিন্ন কলকারখানায় ব্যবহৃত খনিজ সম্পদ সীমিত এবং কখনও শেষ হবে না এমন কিন্তু নয়। মানব সমাজ পরিণাম বিবেচনা না করে, যেমন খুশি অমূল্য খনিজ সম্পদগুলো ব্যবহার করছে। ফলে ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যেই এ সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে মাটির নীচে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও ধাতব পদার্থ ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এগুলো একবার শেষ হয়ে গেলে আর পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কাজেই এগুলো কেবলমাত্র আবশ্যক স্থানেই ব্যবহার করা উচিত। এর সঙ্গে সংরক্ষণের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

আমরা নিজেদের দৈনন্দিন কাজে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় যেন বেশি ব্যবহার না করি। এসো আমরা সবাই এই শপথ নেবো এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যত্নশীল হবো।

আমরা কী শিখলামঃ

- জল, মৃত্তিকা ও খনিজ সম্পদ আমাদের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ।
- সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদগুলো বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত তা না হলে সেগুলো খুব কম সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।
- ভূপৃষ্ঠ ও মাটির নীচে জল যতো বাঁচানো যায় ততোই ভালো।
- বৃষ্টির জল ধরে রেখে প্রায়োজন মতো বিভিন্ন কাজে লাগানো উচিত।
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত প্রয়োগ ও এর সংরক্ষণের প্রতি সচেতন হওয়া দরকার।

অভ্যাস

১) কে কোন ঘরে থাকবে মাঝের ঘর থেকে বেছে লেখো।

খনিজ সম্পদ		বন্য সম্পদ
	কাঠ, বকসাইট, লোহা, গাছ, রূপা, ধূণা, হাতী, চুনাপাথর, সোনা।	

২) 'ক' ও 'খ' স্তম্ভের মধ্যে যার যার সম্পর্ক আছে দাগ টেনে দেখাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
অ্যালুমিনিয়াম	উড়োজাহাজ চালাতে
কয়লা	কাগজ তৈরি করতে
গ্যাসোলিন	বাসনপত্র তৈরি করতে
	লোহাকারখানার ব্যবহারে

৩) জঙ্গল সম্পদের যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করবে কীভাবে?

৪) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীভাবে মৃত্তিকা সম্পদ ব্যবহার করবে?

৫) যদি পৃথিবী থেকে সব কয়লা শেষ হয়ে যায়, তবে কী অসুবিধা হবে?

ভেবে লেখো -

৬) ক) আমাদের রাজ্যে কী কী সুবিধা থাকার জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে?

খ) শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমাদের কী সুবিধা হচ্ছে?

৭) তোমার বাড়িতে কিংবা স্কুলে একবার ব্যবহার করার পরে সেই জল আবার কী কাজে তুমি ব্যবহার করতে পারবে?

৮) জঙ্গল সুরক্ষার জন্য তিনটি স্লোগান প্রস্তুত কর।

৯) তুমি তোমার বন্ধুকে জলের যথোচিত ব্যবহার সম্পর্কে কী পরামর্শ দেবে?

১০) পাঁচটি খনিজ সম্পদের উদাহরণ দাও। এদের মধ্যে কোনগুলি তোমার অঞ্চলে পাওয়া যায়?

ঘরে বসে কর -

তোমার অঞ্চলের মাটি পরীক্ষা কর। এই মাটিতে কী মিশেছে লক্ষ কর। মাটি অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে কীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব, গ্রামের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে তার একটি বিবরণী প্রস্তুত কর।

ভারতীয় সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে এক সার্বভৌম সমাজবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে

- সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ;
- চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা;
- সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং

তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্য নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ,

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, প্রণয়ন এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"